ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দিক

বি.এসসি-অনার্স (১ম-শ্রেণী), এম.এসসি (১ম-শ্রেণী)
এম. ফিল, পি-এইচ. ডি (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

website www.drabsiddiq.com, Email-dr.absiddiq@gmail.com

হাইড্রা

Hydra

হাইড্রা হলো নিডারিয়া পর্বের অতি পরিচিত একটি ক্ষুদ্র প্রাণী। এরা মুক্তজীবী প্রাণী এবং স্বাদুপানির পলিপ নামে পরিচিত।

প্রাণীজগতে দুইটি **diploblastic** বা দ্বিস্তরী পর্ব রয়েছে। নিডারিয়া ও টিনোফোরা পর্ব।
হাইড্রা নিডারিয়া পর্বের প্রাণী।

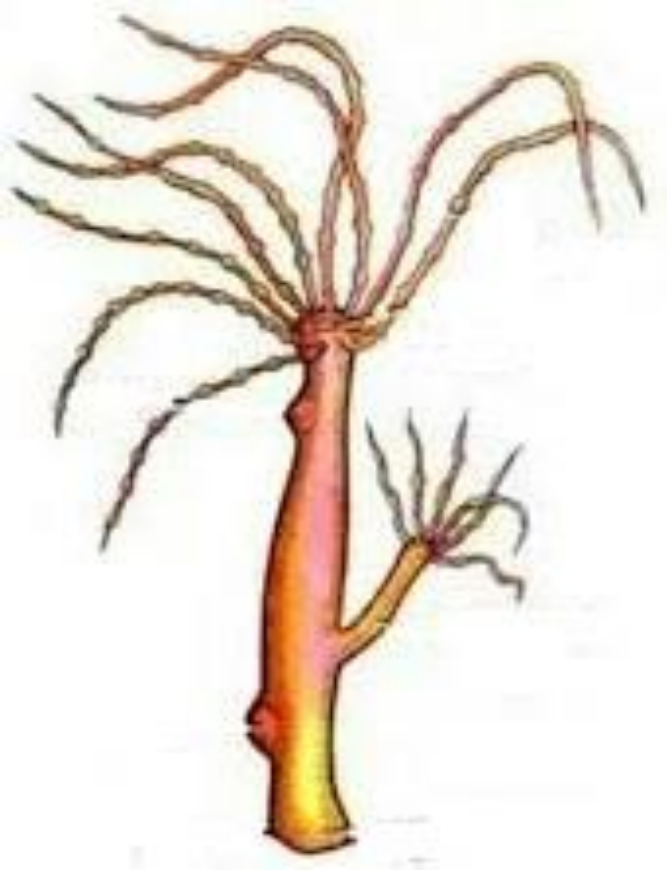

সুইস প্রকৃতিবিজ্ঞানী আব্রাহাম ট্রেম্বলে (১৭১০-১৭৮৪) হাইড্রা আবিষ্কার করেন। ১৭৫৮ সালে ক্যারোলাস লিনিয়াস এর নাম দেন হাইড্রা (***Hydra***)।

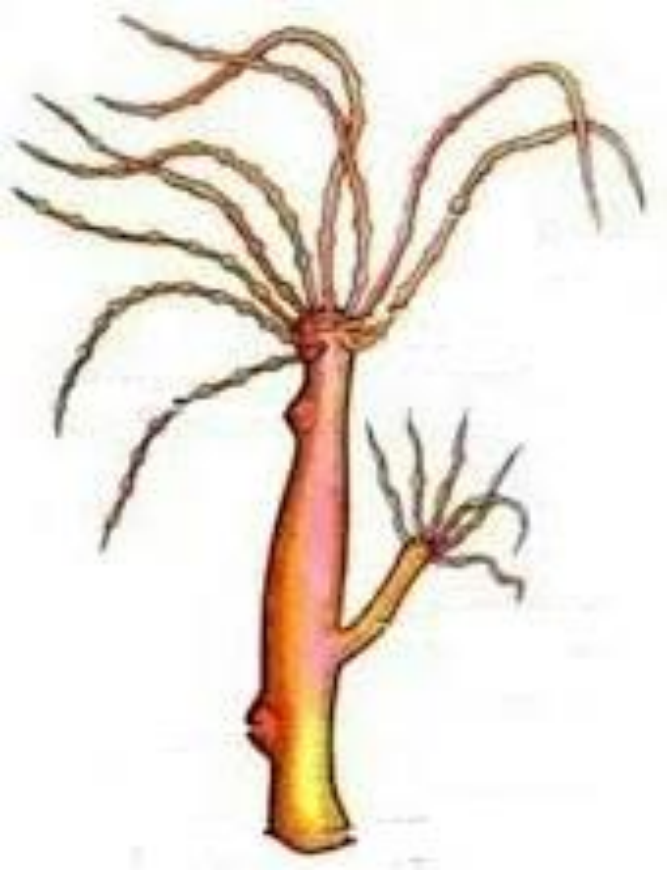

গ্রীক রুপকথায় বর্ণিত নয় মাথাবিশিষ্ট ড্রাগন হাইড্রার (*Hydra*) নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় ***Hydra*** । ড্রাগন হাইড্রার একটি মাথা কেটে দিলে দুইটি মাথা সৃষ্টি হতো। এর কোন অংশ বিছিন্ন হয়ে গেলে সে অংশ থেকে নতুন হাইড্রা সৃষ্টি হতো। অর্থাৎ হাইড্রার পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা আছে।

মহাবীর হারকিউলিস এই দানবকে বধ করেন।

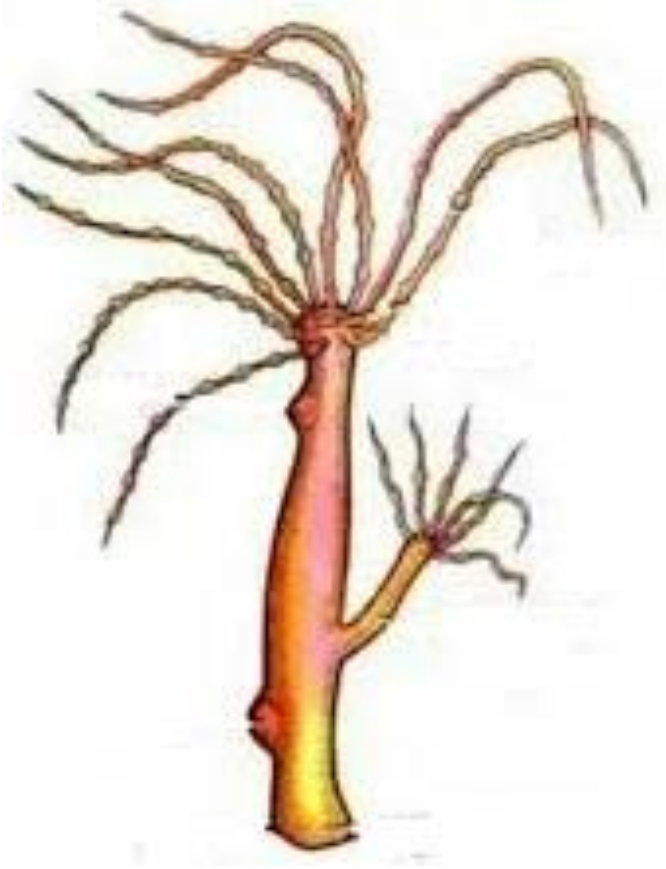

বাংলাদেশে হাইড্রার প্রজাতি

পৃথিবীতে ৪০টি মতো হাইড্রা প্রজাতি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ৩টি প্রজাতির হাইড্রা পাওয়া যায়।

বর্ণহীন বা হলুদ-বাদামী বর্ণের ***Hydra vulgaris***
বাদামী বর্ণের ***Hydra oligactis* (*Hydra fusca*)**
সবুজ বর্ণের ***Hydra viridissima***

বাংলাদেশে স্বাদুপানির জলাশয়ে ***Hydra vulgaris*** প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

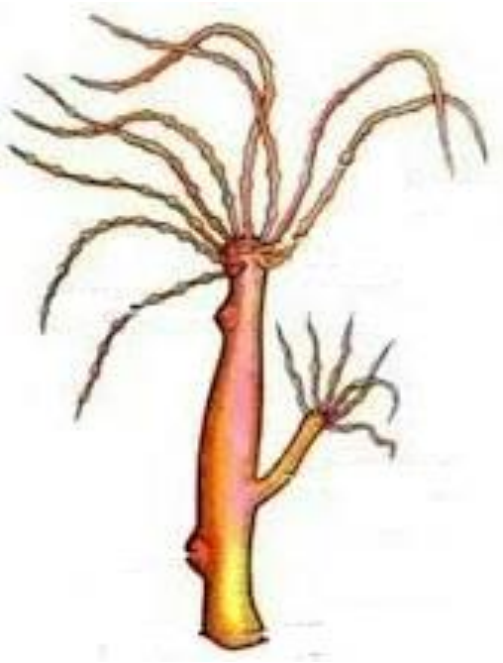

Hydra vulgaris

হলুদ-বাদামী

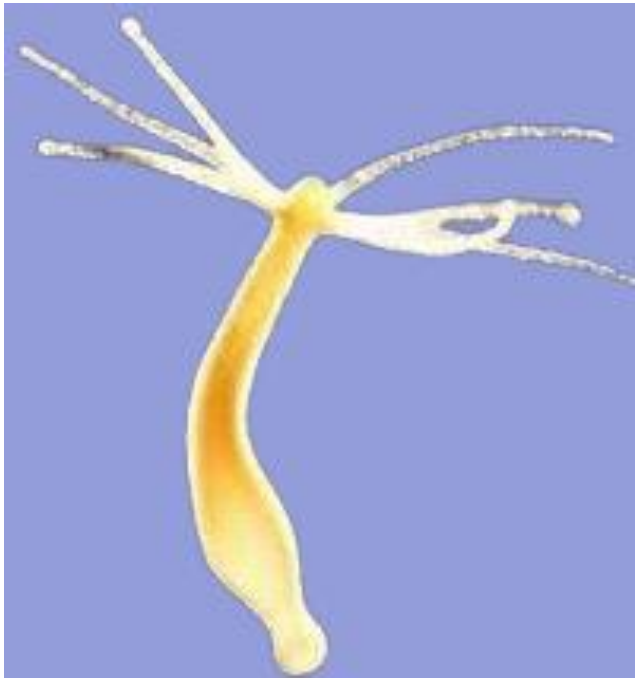

Hydra oligactis

বাদামী

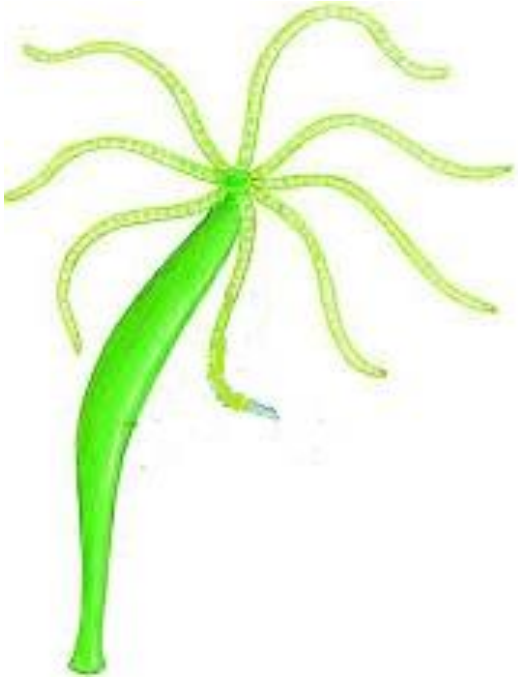

Hydra viridissima

সবুজ

হাইড্রার বাসস্থান

হাইড্রা একটি মুক্তজীবী প্রাণী। পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির হাইড্রা পাওয়া যায়। স্বাদুপানির জলাশয় পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, হ্রদ, ঝর্ণা প্রভৃতিতে বাস করে। স্থির, শীতল ও পরিষ্কার পানিতে এদের বেশি পাওয়া যায়।

ঘোলা, উষ্ণ ও চলমান পানিতে এদের পাওয়া যায় না। এরা নিমজ্জিত কোন কঠিন বস্তু কিংবা উদ্ভিদের পাতার সাথে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকে।

হাইড্রার খাদ্য

হাইড্রা মাংসাশী (**carnivorous**) প্রাণী। পতঙ্গের লার্ভা, সাইক্লপস, ড্যাফনিয়া/ক্রাস্টাসিয়া, ছোট কৃমি, অ্যানিলিড, মাছের ডিম, ব্যাঙাচি প্রভৃতি হাইড্রার খাদ্য। তবে প্রধান খাদ্য হলো ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী।

হাইড্রা কেবল সেসব প্রাণীকে শিকার করে যাদের কলারসে গ্লুটাথিওন থাকে।

হাইড্রার বাহ্যিক গঠন

Hydra নলাকৃতির বা চোঙ্গাকৃতির ক্ষুদ্র প্রাণী। প্রসারিত অবস্থায় এরা প্রায় ১-৩ সেমি লম্বা এবং ১ মিমি চওড়া। পানি থেকে তুলে আনলে এরা একটি নরম ও আকারবিহীন পিন্ডে পরিনত হয়।

হাইড্রার দেহ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।

১। হাইপোস্টোম, ২। দেহ কান্ড ও ৩। পদতল।

১। হাইপোস্টোম ঃ দেহের উপরের দিকে ছোট ও মোচাকৃতির সংকোচনশীল অঙ্গকে হাইপোস্টোম বলে। এতে মুখছিদ্র থাকে। মুখছিদ্র খাদ্য, পানি ও অক্সিজেন গ্রহন করে। ইহা অপাচ্য বা বর্জ্য পদার্থ বাইরে বের করে দেয়।

২। দেহকান্ড ঃ হাইপোস্টোম ও পদতল ব্যতীত সমগ্র অংশকে দেহকান্ড বলে। দেহকান্ডের বিভিন্ন অংশ হলো-

(i) কর্ষিকা ঃ হাইপোস্টোমের গোড়ায় সরু, লম্বা, ফাঁপা ও সংকোচন-প্রসারণশীল ৬-১০টি কর্ষিকা থাকে। প্রতিটি কর্ষিকা দেহের চেয়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ লম্বা। কর্ষিকার বহিঃপ্রাচীরে টিউমারের মতো ছোট ছোট নেমাটোসিস্ট ব্যাটারী থাকে। প্রতিটি ব্যাটারীতে কয়েকটি করে বিভিন্ন ধরণের নেমাটোসিস্ট থাকে। ইহা শিকার ধরা, আত্মরক্ষা ও চলনে অংশ গ্রহণ করে।

(ii) মুকুল ঃ অনুকূল পরিবেশ বা গ্রীষ্মকালে পরিবেশে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে। হাইড্রা খাদ্য গ্রহণ করে দৈহিক বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে দেহের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক বা একাধিক মুকুল সৃষ্টি হয়। প্রতিটি মুকুল পরিপক্ক হয়ে নতুন হাইড্রার জন্ম দেয়। ইহা হাইড্রার অন্যতম অযৌনজনন পদ্ধতি।

(iii) জননাঙ্গ ঃ হেমন্তকাল ও শীতকালে পরিনত হাইড্রার দেহকান্ডে অস্থায়ী জননাঙ্গ গঠিত হয়। দেহের উপরের দিকে শক্রাশয় এবং নিচের দিকে ডিম্বাশয় থাকে। শুক্রাশয়ে শুক্রাণু এবং ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু জনন কাজে অংশ গ্রহণ করে।

৩। পদতল বা পদচাকতি ঃ দেহের নিম্নাংশে গোলাকার ও চাপা অংশ হলো পদতল। পদতল হতে নিঃসৃত আঠালো পদার্থ হাইড্রাকে কোন বস্তুর সাথে আটকে রাখে। বুদবুদ পানিতে ভাসতে সাহায্য করে। ইহা ক্ষণপদ গঠন করে হাইড্রাকে গ্লাইডিং চলনে সাহায্য করে।

হাইড্রার বাহ্যিক গঠন

Hydra নলাকৃতির বা চোঙ্গাকৃতির ক্ষুদ্র প্রাণী। প্রসারিত অবস্থায় এরা প্রায় ১-৩ সেমি লম্বা এবং ১ মিমি চওড়া। পানি থেকে তুলে আনলে এরা একটি নরম ও আকারবিহীন পিন্ডে পরিনত হয়।

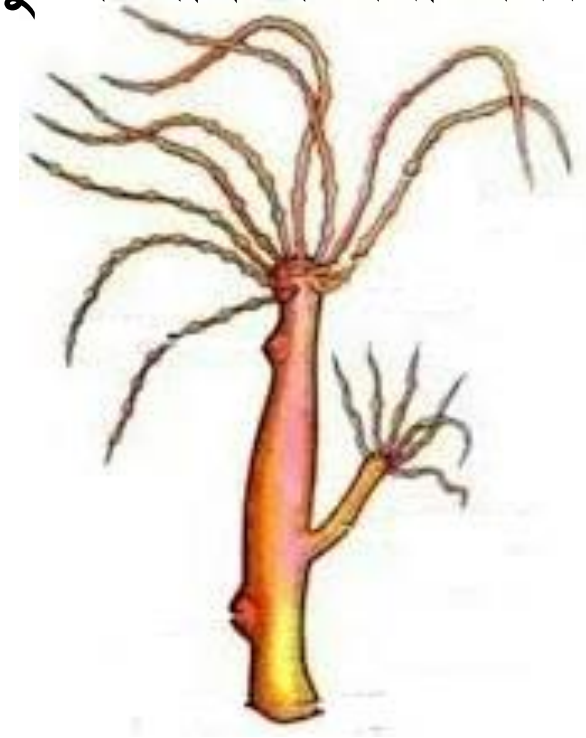

হাইড্রার দেহ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত

১। হাইপোস্টোম
২। দেহ কান্ড
৩। পদতল

১। হাইপোস্টোম ঃ দেহের উপরের দিকে ছোট ও মোচাকৃতির সংকোচনশীল অঙ্গকে হাইপোস্টোম বলে। এতে মুখছিদ্র থাকে। মুখছিদ্র খাদ্য, পানি ও অক্সিজেন গ্রহন করে। ইহা অপাচ্য বা বর্জ্য পদার্থ বাইরে বের করে দেয়।

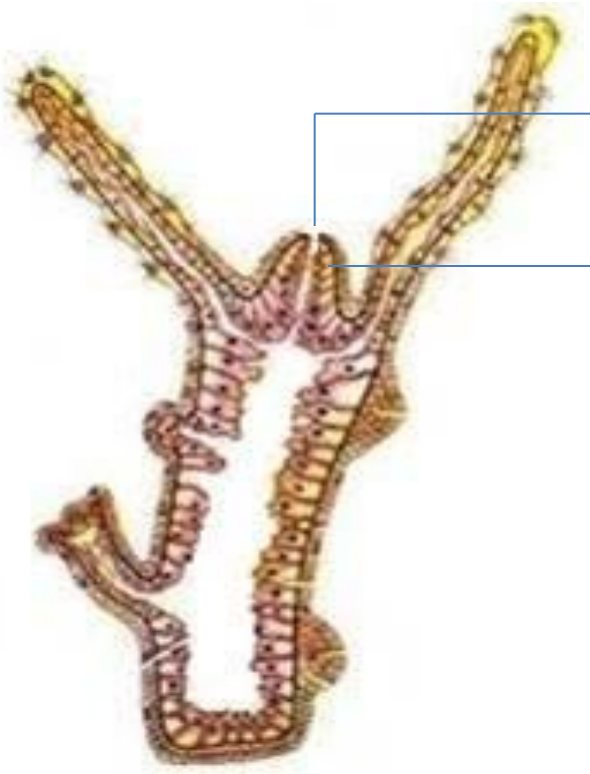

মুখছিদ্র

হাইপোস্টোম

২। দেহকান্ড ঃ হাইপোস্টোম ও পদতল ব্যতীত সমগ্র অংশকে দেহকান্ড বলে। (i) কর্ষিকা (ii) মুকুল (iii) জননাঙ্গ

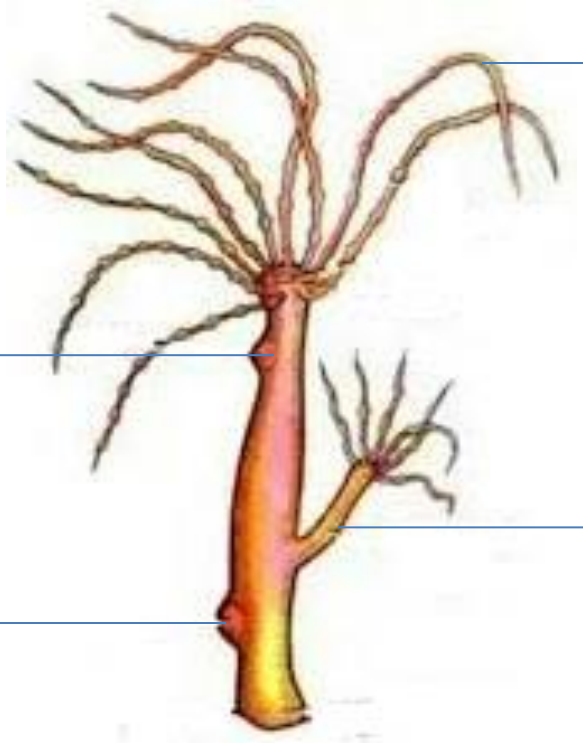

কর্ষিকা

শুক্রাশয়

মুকুল

ডিম্বাশয়

২। দেহকান্ড

(i) কর্ষিকা ঃ হাইপোস্টোমের গোড়ায় সরু, লম্বা, ফাঁপা ও সংকোচন-প্রসারণশীল ৬-১০টি কর্ষিকা থাকে। প্রতিটি কর্ষিকা দেহের চেয়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ লম্বা। কর্ষিকার বহিঃপ্রাচীরে টিউমারের মতো ছোট ছোট নেমাটোসিস্ট ব্যাটারী থাকে। প্রতিটি ব্যাটারীতে কয়েকটি করে বিভিন্ন ধরণের নেমাটোসিস্ট থাকে। ইহা শিকার ধরা, আত্মরক্ষা ও চলনে অংশ গ্রহণ করে।

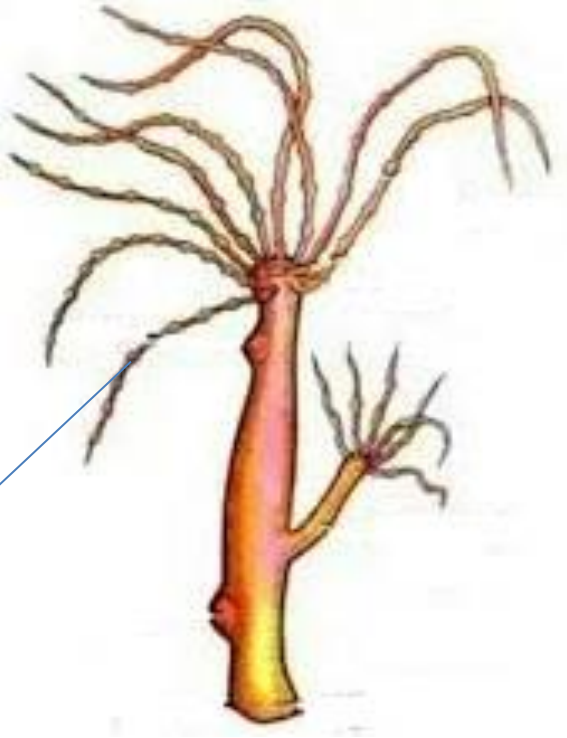

২। দেহকান্ড

(ii) মুকুল ঃ অনুকূল পরিবেশ বা গ্রীষ্মকালে পরিবেশে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে। হাইড্রা খাদ্য গ্রহণ করে দৈহিক বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে দেহের সংবেদী অঞ্চলে এক বা একাধিক মুকুল সৃষ্টি হয়। প্রতিটি মুকুল পরিপক্ক হয়ে নতুন হাইড্রার জন্ম দেয়। ইহা হাইড্রার অন্যতম অযৌনজনন পদ্ধতি।

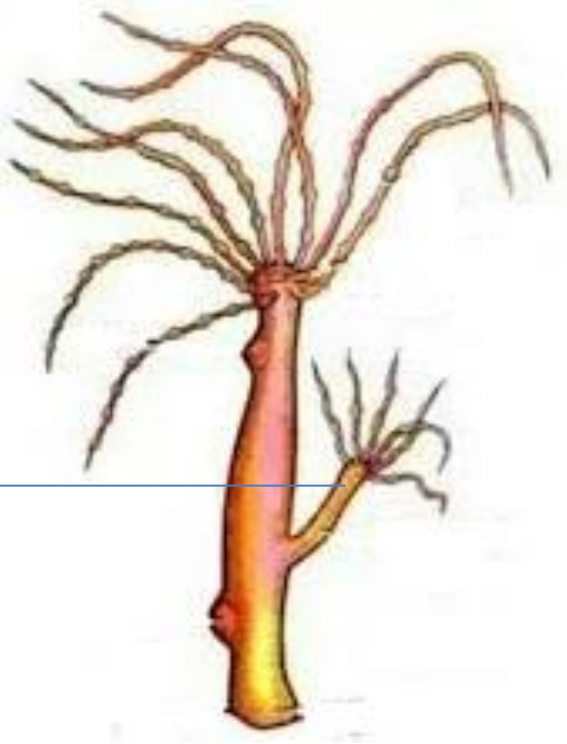

২। দেহকান্ড

(iii) জননাঙ্গ ঃ হেমন্তকাল ও শীতকালে পরিনত হাইড্রার দেহকান্ডে অস্থায়ী জননাঙ্গ গঠিত হয়। দেহের উপরের দিকে শক্রাশয় এবং নিচের দিকে ডিম্বাশয় থাকে। শুক্রাশয়ে শুক্রাণু এবং ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু জনন কাজে অংশ গ্রহণ করে।

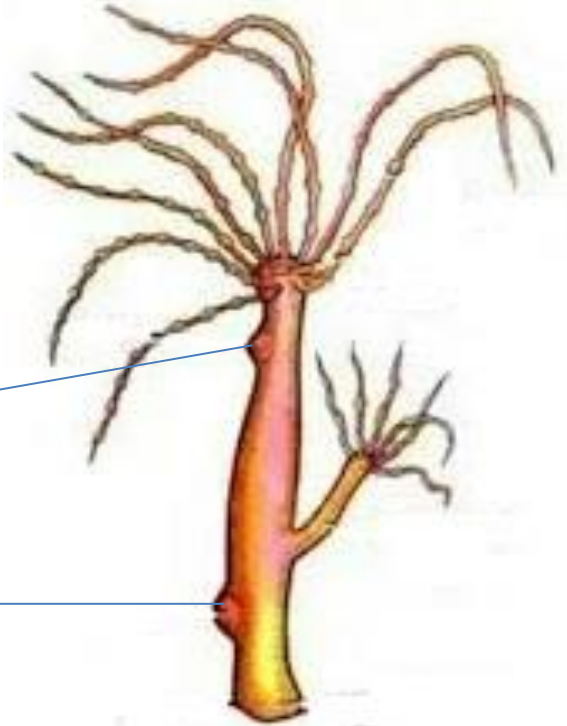

৩। পদতল বা পদচাকতি ঃ দেহের নিম্নাংশে গোলাকার ও চাপা অংশ হলো পদতল। পদতল হতে নিঃসৃত আঠালো পদার্থ হাইড্রাকে কোন বস্তুর সাথে আটকে রাখে। বুদবুদ পানিতে ভাসতে সাহায্য করে। ইহা ক্ষণপদ গঠন করে হাইড্রাকে গ্লাইডিং চলনে সাহায্য করে।

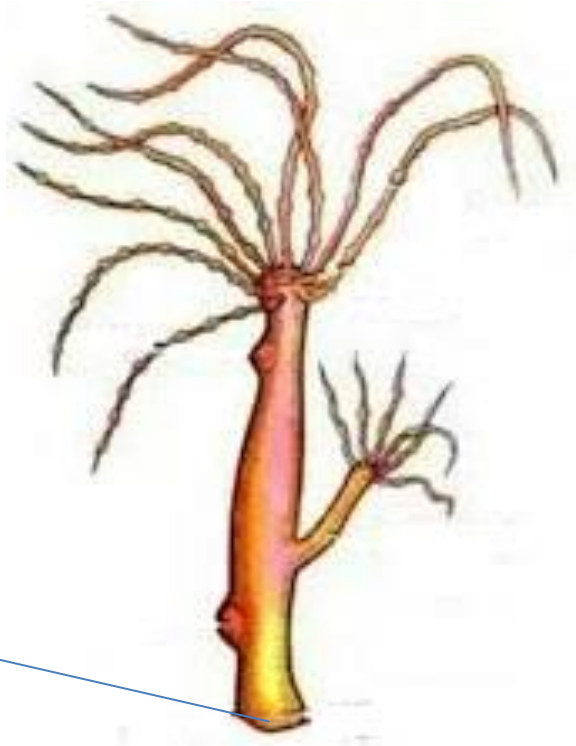

পদতল বা পদচাকতি

Hydra-র লম্বচ্ছেদ

Hydra-র লম্বচ্ছেদ

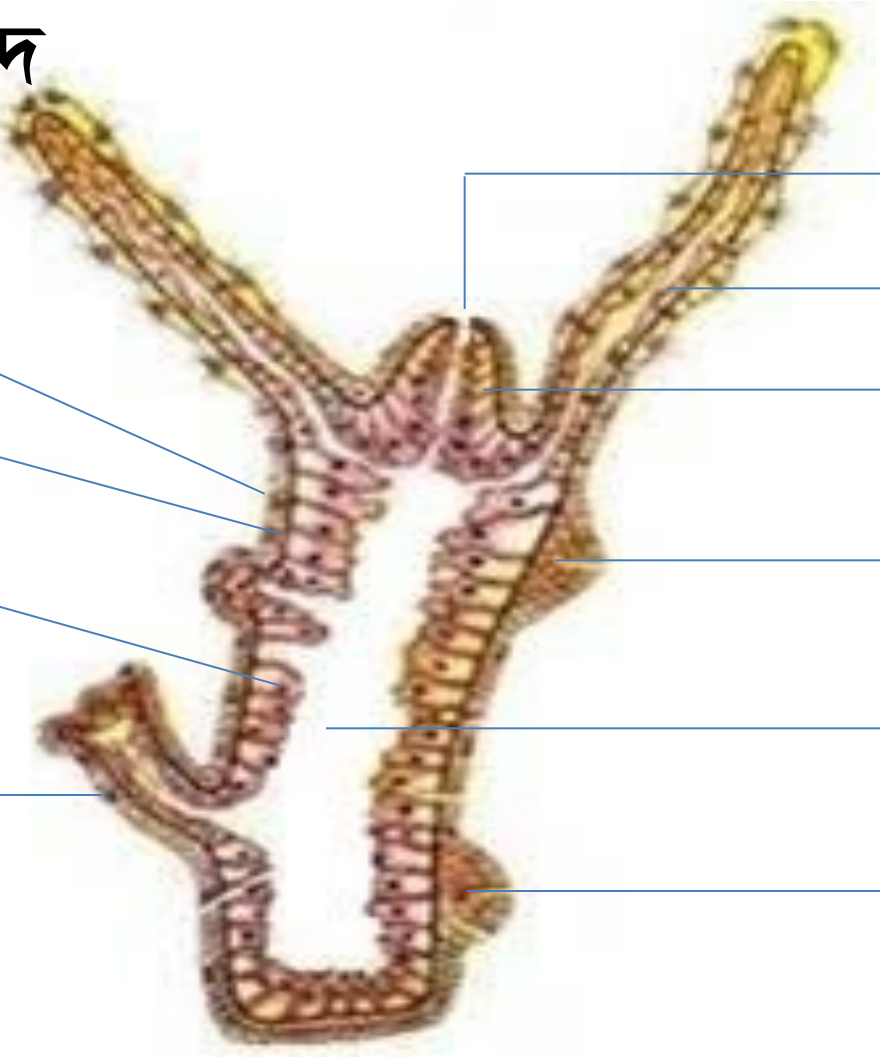

মুখছিদ্র
কর্ষিকা
হাইপোস্টোম
শুক্রাশয়
সিলেন্টেরন
ডিম্বাশয়
বহিঃত্বক
মেসোগ্লিয়া
অন্তঃত্বক
মূকুল

Hydra-র প্রস্থচ্ছেদ

CB-17, SB-17

বহিঃত্বক
মেসোগ্লিয়া
অন্তঃত্বক
পেশী আবরণী কোষ
সিলেন্টেরন
ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
সংবেদী কোষ
নিডোসাইট কোষ

১। হাইড্রার এপিডার্মিস
বহিঃত্বক

২। হাইড্রার অন্তঃত্বক
গ্যাস্ট্রোডার্মিস

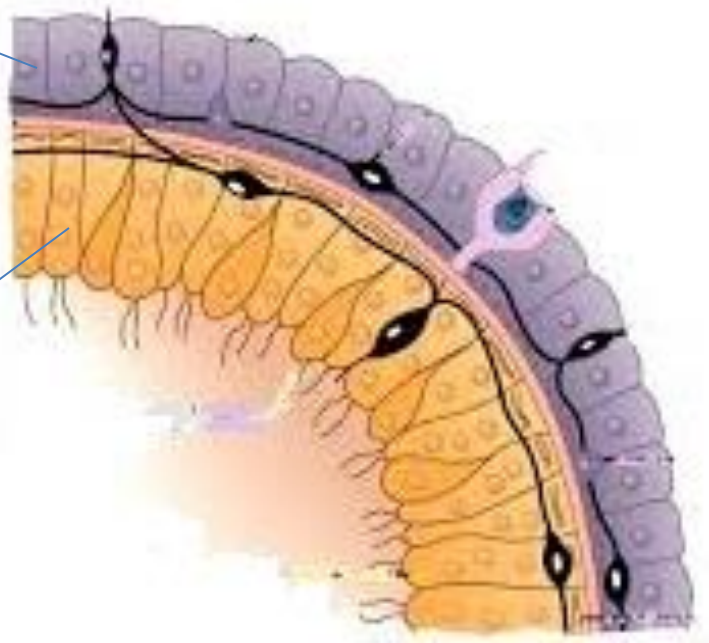

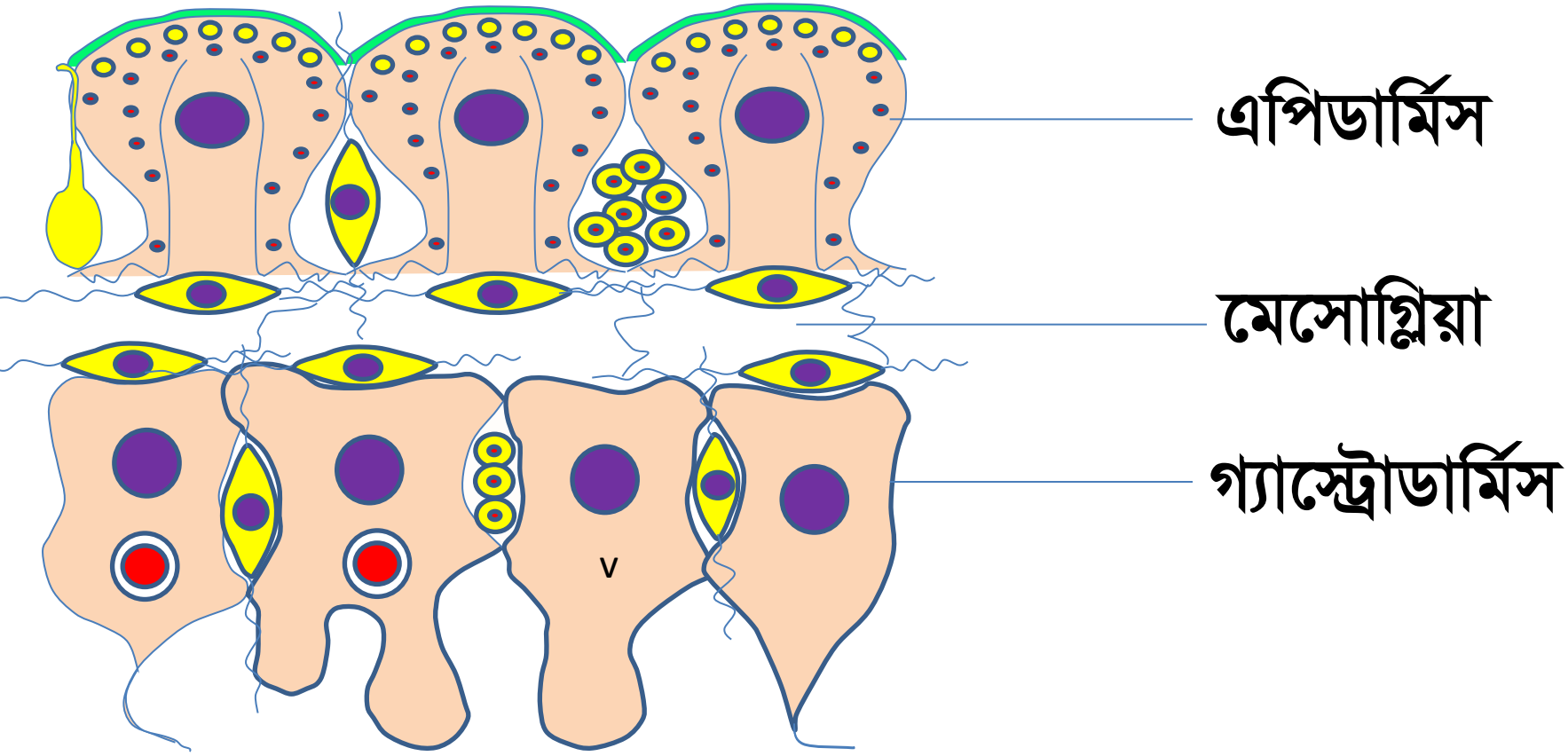
এপিডার্মিস
মেসোগ্লিয়া
গ্যাস্ট্রোডার্মিস
V

হাইড্রার এপিডার্মিস বা বহিঃত্বক

CB-17

দেহপ্রাচীরের বাইরের দিকের কোষ স্তরকে এপিডার্মিস বলে। এপিডার্মিসের পুরুত্ব দেহপ্রাচীরের এক-তৃতীয়াংশ

বহিঃত্বকে ৭ ধরণের কোষ থাকে

১। পেশী আবরণী কোষ
২। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
৩। সংবেদী কোষ
৪। স্নায়ু কোষ
৫। গ্রন্থি কোষ
৬। জনন কোষ
৭। নিডোব্লাস্ট

১। পেশী আবরণী কোষ

পেশি আবরণী কোষ বহিঃত্বকের সমগ্র অংশ জুড়ে অবস্থান করে। কোষ গুলো দেখতে স্তম্ভাকার। প্রতিটি কোষের বাইরের দিক চওড়া ও মুক্ত এবং ভিতরের দিক বদ্ধ ও সরু। ভিতরের দিকে দু'টি পেশী প্রবর্ধক থাকে। একে পেশী লেজও বলা হয়। পেশী লেজের ভিতরে সংকোচনশীল সূত্রক মায়োনিম থাকে।

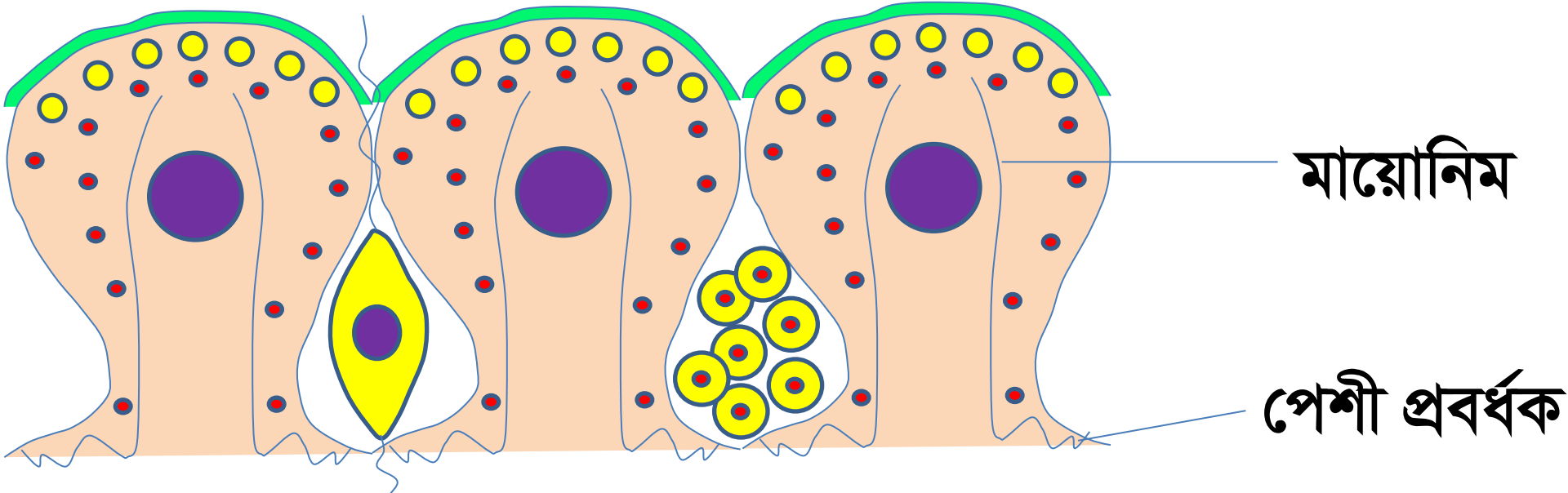

১। পেশী আবরণী কোষ

কোষের সাইটোপ্লাজমে একটি নিউক্লিয়াস, মিউকাস বস্তু ও গ্রানিউলার গ্রন্থি থাকে। মিউকাস বস্তু হতে মিউসিন এবং গ্রানিউলার গ্রন্থি হতে গ্রানিউল নিঃসৃত হয়। পেশি আবরণী কোষ গুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি অবিচ্ছেদ্য আবরণী সৃষ্টি করে।

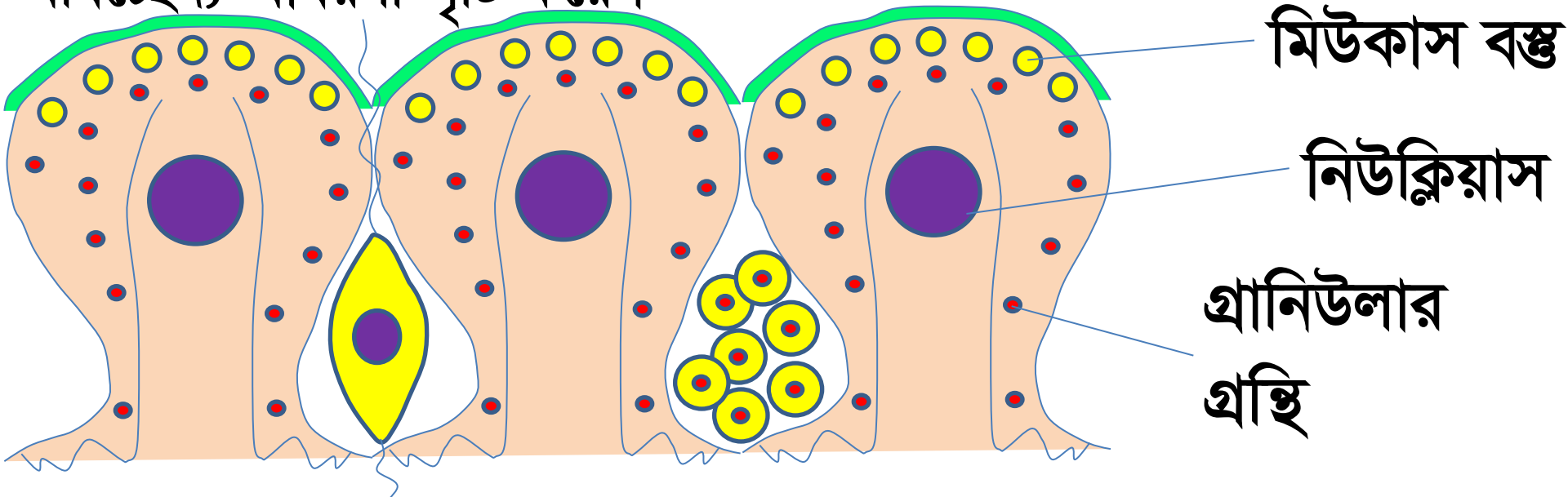

পেশী আবরণী কোষের কাজ

১। ইহা দেহ আবরণী সৃষ্টি করে দেহকে রক্ষা করে
২। মায়োনিম সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়
৩। মিউকাস গ্রন্থির নিঃসরণ দেহকে পিচ্ছিল রাখে
৪। ইহা নেমাটোসিস্ট বহন করে
৫। ইহা সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে চলনে সাহায্য করে

২। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ

পেশি আবরণী কোষের মাঝখানে গুচ্ছাকারে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ অবস্থান করে। কোষ গুলো দেখতে গোলাকার, ডিম্বাকার বা ত্রিকোণাকার। প্রতিটি কোষে একটি নিউক্লিয়াস, অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, লাইসোজোম, রাইবোজোম প্রভৃতি থাকে। ইহা টটিপটেন্সি ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই ইহা প্রয়োজনে অন্য যে কোন কোষে রুপান্তরিত হয়।

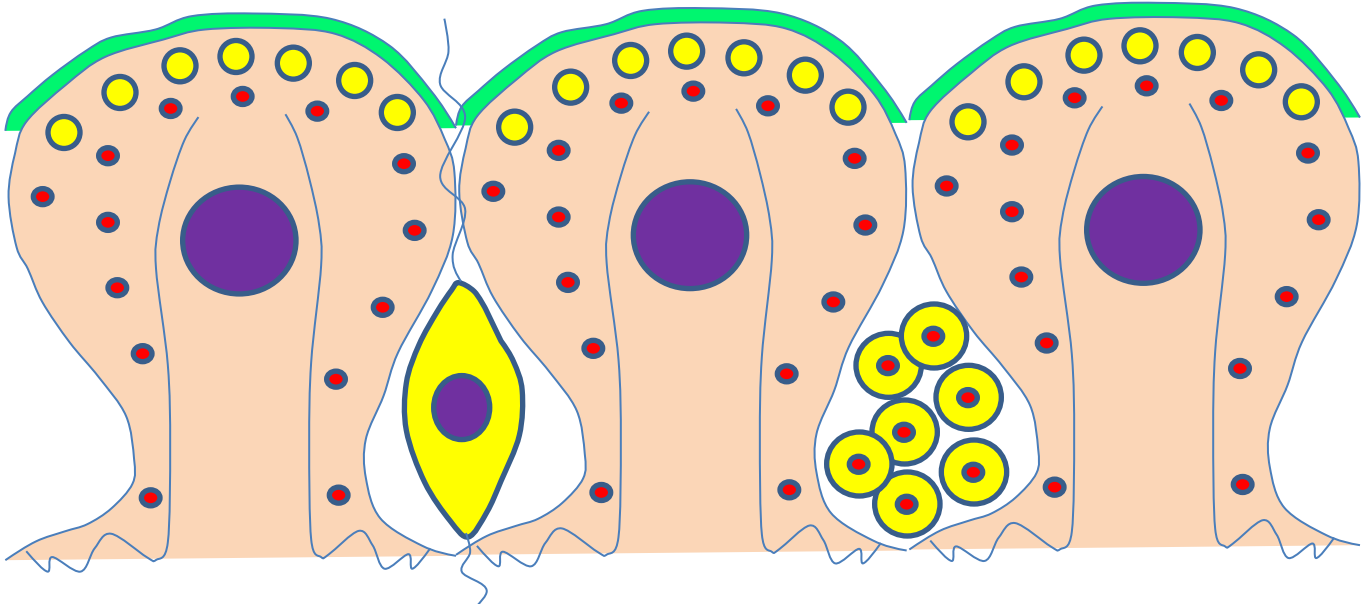

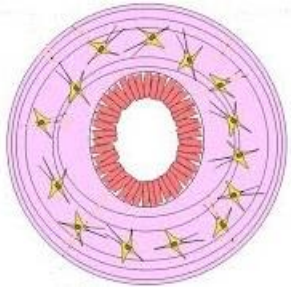

ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের কাজ

১। এ কোষ অন্য যে কোন কোষে রুপান্তরিত হতে পারে

২। ইহা হাইড্রার পুনরুৎপত্তি, বৃদ্ধি, গোনাড ও মুকুল সৃষ্টিতে অংশ নেয়

৩। ৪৫ দিন পর পর দেহ কোষ নষ্ট হয়ে গেলে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ সে স্থান পুরণ করে

৩। সংবেদী কোষ

পেশী আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে বিক্ষিপ্ত ভাবে সংবেদী কোষ অবস্থান করে। তবে কর্ষিকা, হাইপোস্টোম, পদতলে ইহা অসংখ্য। কোষ গুলো দেখতে সরু, লম্বা ও মাকু আকৃতির। অর্থাৎ মধ্যভাগ প্রশস্ত এবং উভয় প্রান্ত সরু। প্রতিটি কোষে সাইটোপ্লাজম ও স্ফীত নিউক্লিয়াস থাকে। এর বাইরের দিকে সংকোচনশীল রোম এবং ভিতরের দিকে সংবেদনশীল স্নায়ু থাকে।

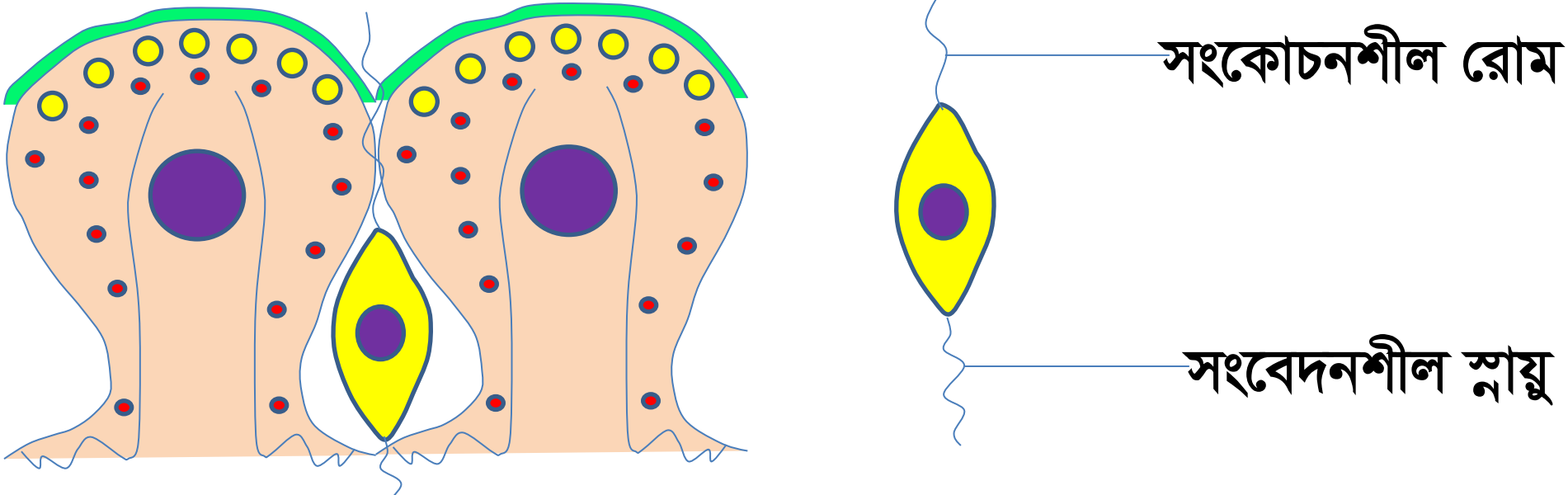

সংবেদী কোষের কাজ

১। ইহা পরিবেশ হতে বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপনা গ্রহণ করে
২। ইহা আত্মরক্ষায় অংশ গ্রহন করে
৩। ইহা বাসস্থান নির্বাচনে সাহায্য করে
৪। ইহা খাদ্য বাছাই করে

৪। স্নায়ু কোষ

স্নায়ু কোষ গুলো এপিডার্মিসের নিচে মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থান করে। কোষ গুলো দেখতে মাকু আকৃতির বা বহুভুজাকার। কোষে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস বিদ্যমান।

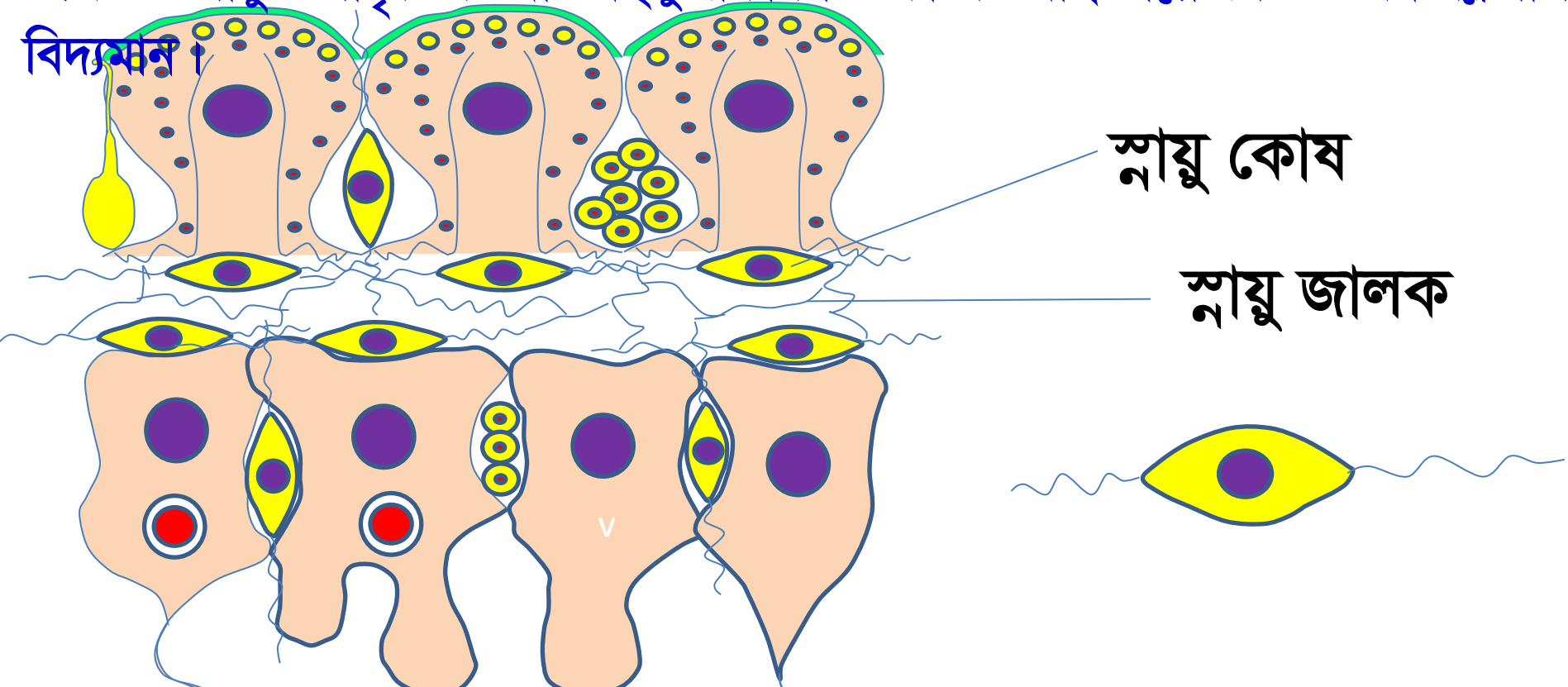

৪। স্নায়ু কোষ

প্রতিটি কোষে দুই বা ততোধিক শাখাযুক্ত স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে। স্নায়ুতন্ত্র গুলো পরস্পর মিলিত হয়ে স্নায়ু জালিকা গঠন করে।

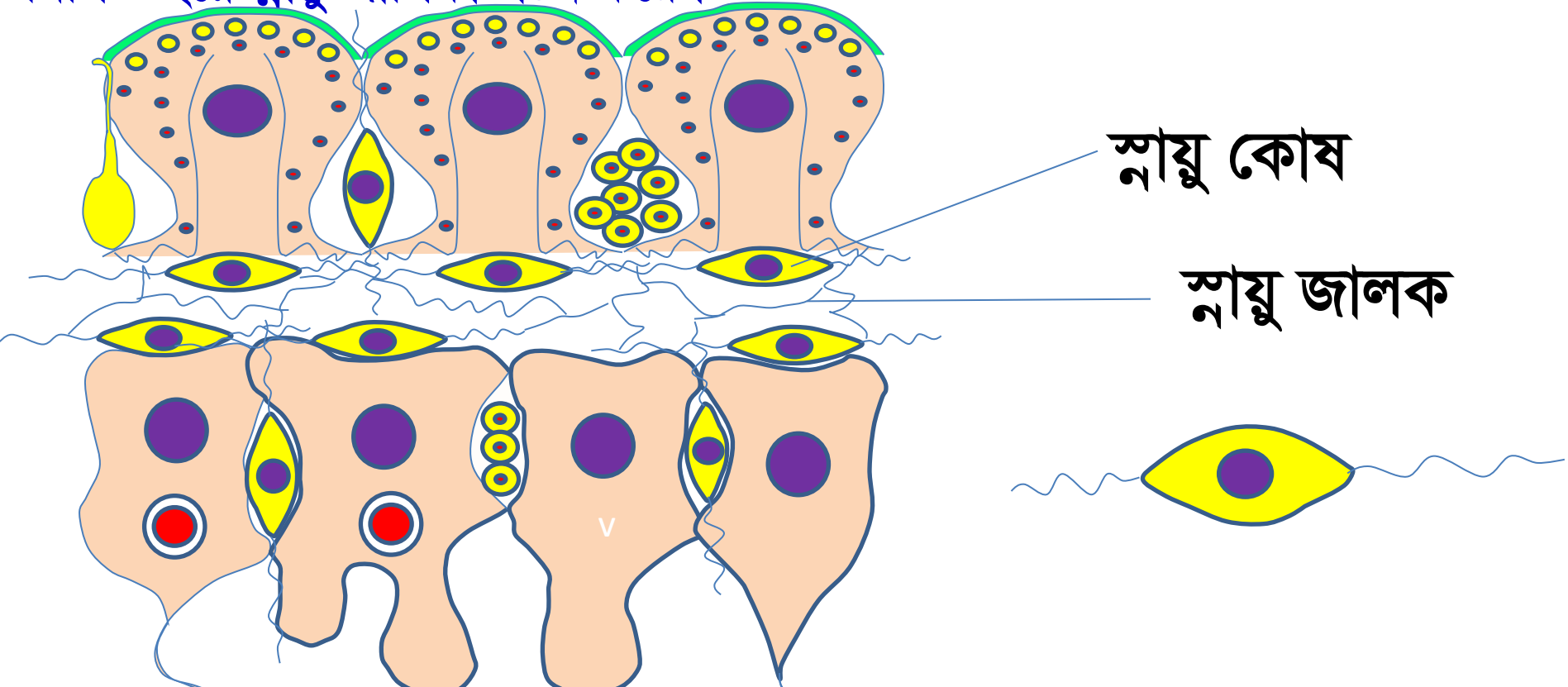

স্নায়ু কোষের কাজ

১। ইহা সংবেদী কোষ হতে স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে প্রতিবেদন সৃষ্টি করে
২। ইহা বিভিন্ন কোষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে

৫। গ্রন্থি কোষ

গ্রন্থি কোষ গুলো পাদচাকতি, হাইপোস্টোম ও কর্ষিকায় অবস্থান করে। কোষ গুলো দেখতে নলাকার, দানাযুক্ত বা ডিম্বাকার হতে পারে। ইহাতে মিউকাস গ্রন্থি, এনজাইম গ্রন্থি ও আঠালো রস নিঃসরণকারী গ্রন্থি রয়েছে।

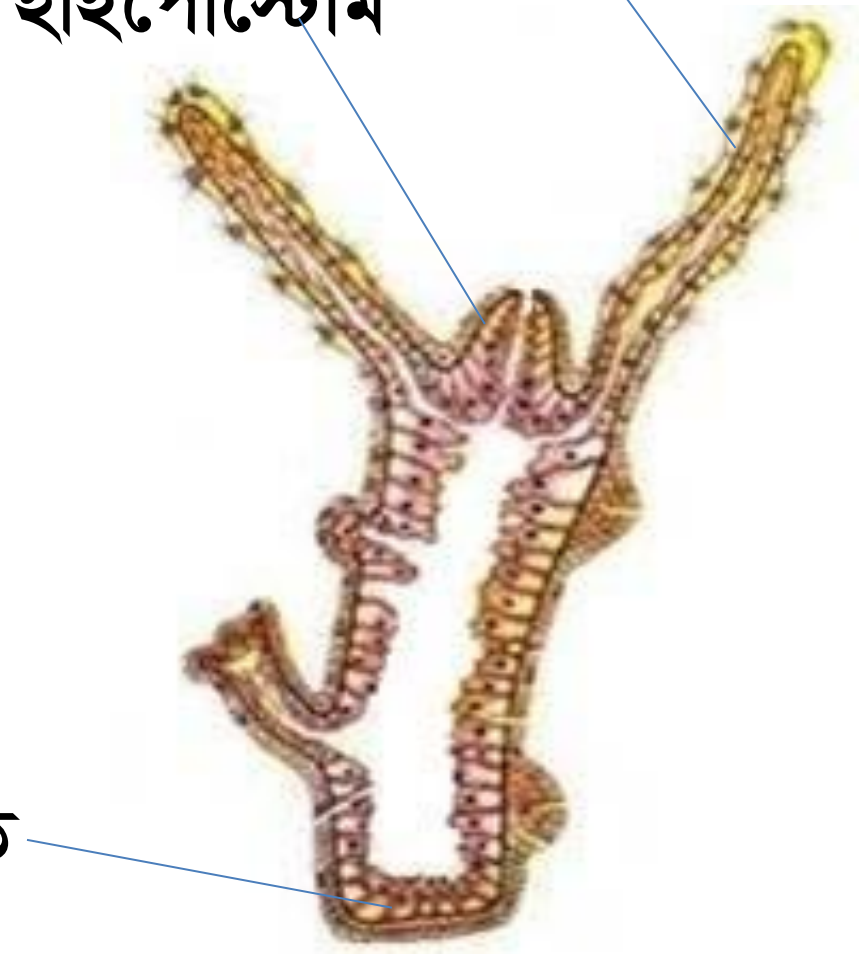

গ্রন্থি কোষের কাজ

১। এ কোষ খাদ্য গলাধঃকরণে সাহায্য করে

২। নিঃসৃত আঠালো রস হাইড্রাকে কোন বস্তুর সাথে আটকে রাখে

৩। ইহা ক্ষণপদ সৃষ্টি করে চলনে সাহায্য করে

৪। বুদবুদ সৃষ্টি করে হাইড্রাকে পানিতে ভাসতে সাহায্য করে

৬। জনন কোষ

প্রজনন ঋতুতে হাইড্রার দেহ কান্ডে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ হতে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় সৃষ্টি হয়। শুক্রাশয় উপরে এবং ডিম্বাশয় নিচে থাকে। শুক্রাশয়ে শুক্রাণু এবং ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। শুক্রাণু অতি ক্ষুদ ও নিউক্লিয়াসযুক্ত।

ইহা মস্তক, মধ্যখন্ড ও চলনক্ষম লেজ দ্বারা গঠিত।

ডিম্বাণু বড়, গোলাকার ও তিনটি পোলার বডি যুক্ত।

কাজ

শুক্রাণু ও ডিম্বাণু জনন

কাজে অংশ গ্রহণ করে

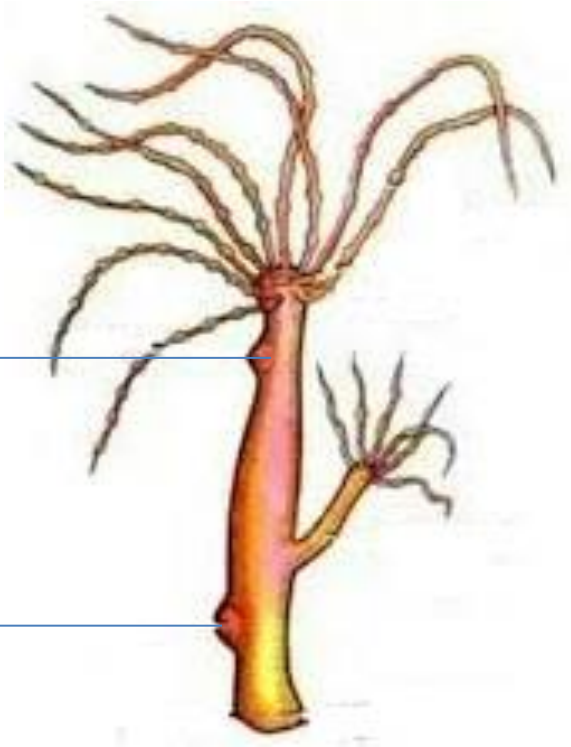

৭। নিডোব্লাস্ট

হাইড্রার পদতল ছাড়া সর্বত্র নিডোব্লাস্ট কোষ বিস্তৃত। ইহা পেশি আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান করে। কোষ গুলো দেখতে গোলাকার, ডিম্বাকার, ফ্ল্যাক্স আকৃতির, পেয়ালাকার বা নাসপাতির মতো। প্রতিটি কোষ দ্বি-আবরণী বিশিষ্ট এবং একটি মাত্র নিউক্লিয়াস যুক্ত। কোষের ভিতরে প্যাচানো সুতাযুক্ত নেমাটোসিস্ট থাকে।

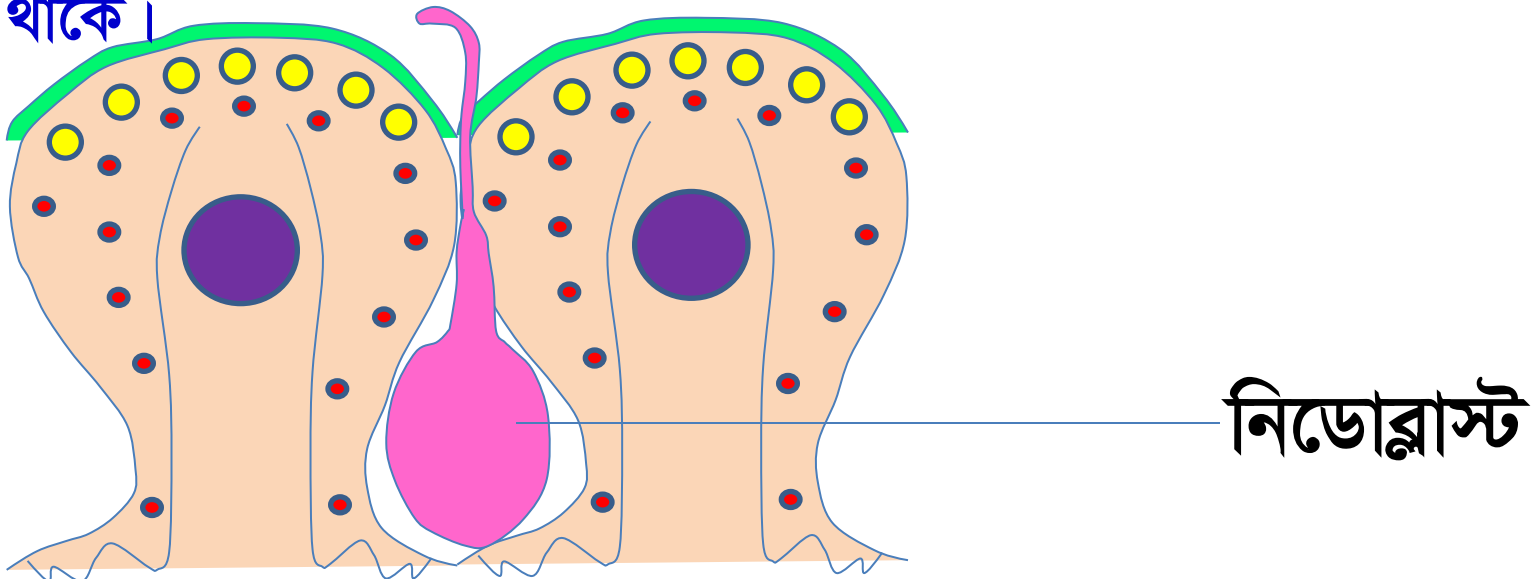

নিডোব্লাস্ট কোষের কাজ

১। ইহা খাদ্য গ্রহনে সাহায্য করে
২। ইহা চলনে সাহায্য করে
৩। আত্মরক্ষায় অংশ গ্রহণ করে

মেসোগ্লিয়া
মেসোল্যামিয়া
Mesogloea

নিডারিয়া জাতীয় প্রাণীদের এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মাঝখানে যে জেলীর মতো আঠালো অকোষীয় স্তর থাকে তাকে মেসোগ্লিয়া বলে। ইহা পাতলা, বর্ণহীন ও স্থিতিস্থাপক। এর ব্যাস ০.১ মাইক্রন।

মেসোগ্লিয়া

মেসোগ্লিয়ার কাজ

১। বহিঃত্বক ও অন্তঃত্বকের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

২। সংযুক্তি তল হিসেবে কাজ করে।

৩। দেহকে সংকোচন-প্রসারণ করে।

হাইড্রার অন্তঃত্বক বা গ্যাস্ট্রোডার্মিস

CB-17

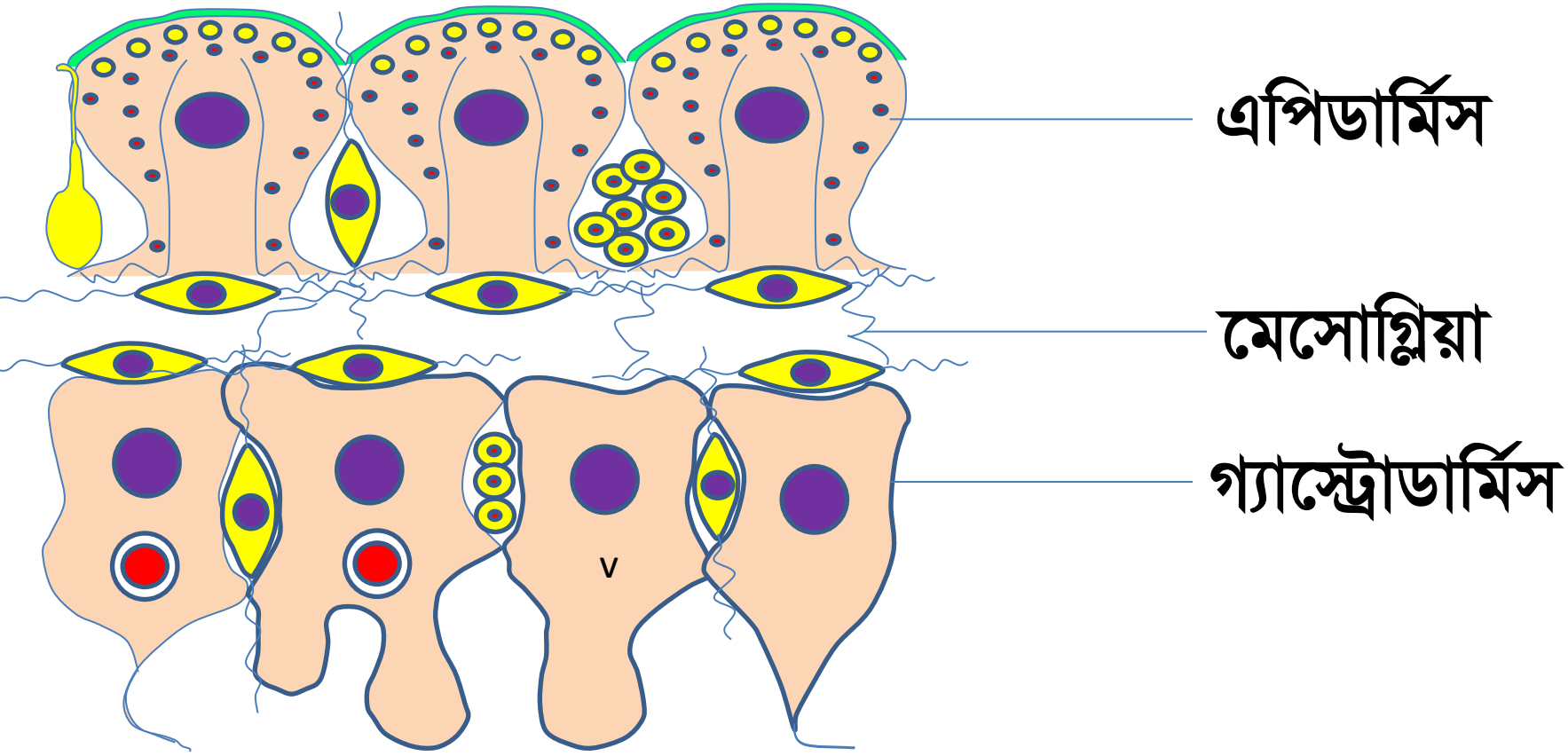
এপিডার্মিস
মেসোগ্লিয়া
গ্যাস্ট্রোডার্মিস
V

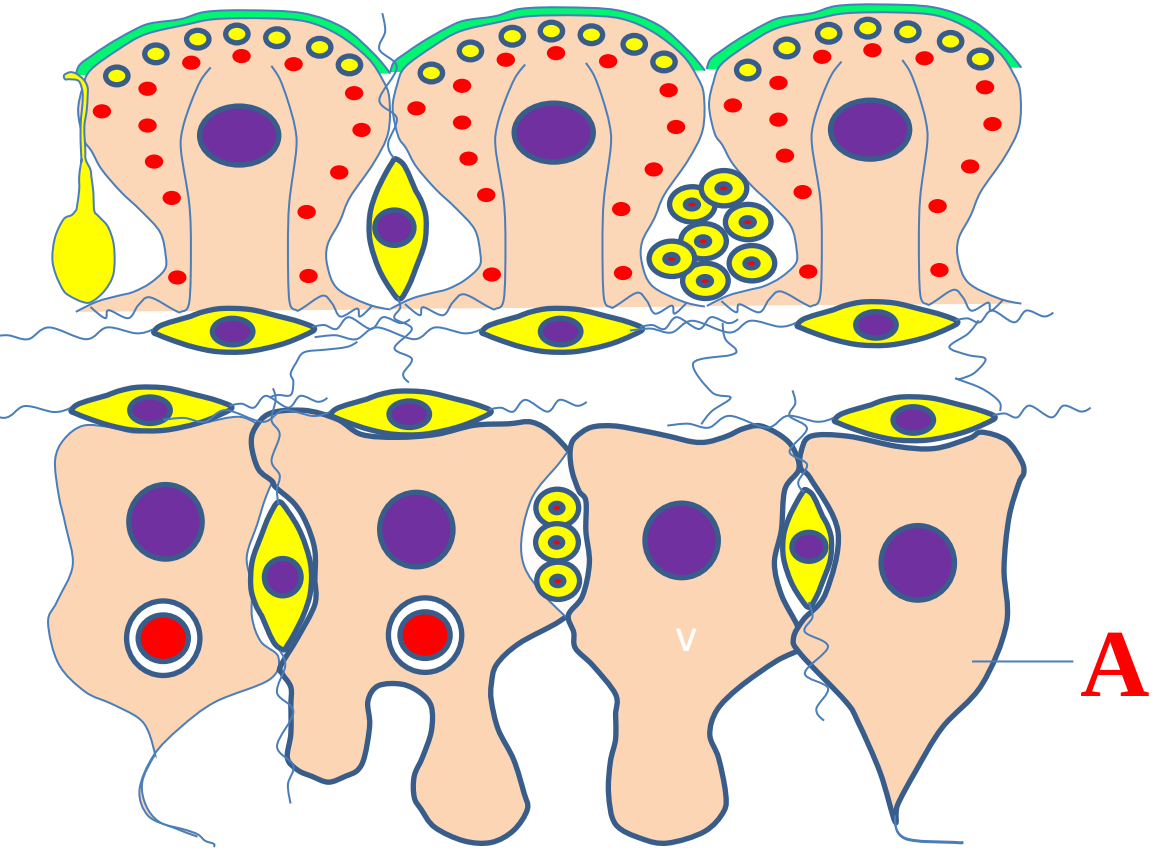
V
A

দেহপ্রাচীরের ভিতরের দিকের কোষ স্তরকে গ্যাস্ট্রোডার্মিস বলে।
গ্যাস্ট্রোডার্মিসের পুরুত্ব দেহপ্রাচীরের দুই-তৃতীয়াংশ

অন্তঃত্বকে ৫ ধরণের কোষ থাকে

১। পুষ্টি কোষ বা পেশি আবরণী কোষ

২। গ্রন্থি কোষ

৩। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ

৪। স্নায়ু কোষ

৫। সংবেদী কোষ

১। পুষ্টি কোষ বা পেশি আবরণী কোষ

পুষ্টি কোষ গ্যাস্ট্রোডার্মিসের বেশির ভাগ অংশজুড়ে অবস্থান করে। ইহা দেখতে স্তম্ভাকার। প্রতিটি কোষে একটি বড় নিউক্লিয়াস ও গহ্বর থাকে। এতে সংকোচনশীল তন্তুযুক্ত পেশিলেজ সৃষ্টি হয়।

পুষ্টি কোষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়

(i) ফ্ল্যাজেলীয় কোষ

(ii) ক্ষণপদীয় কোষ

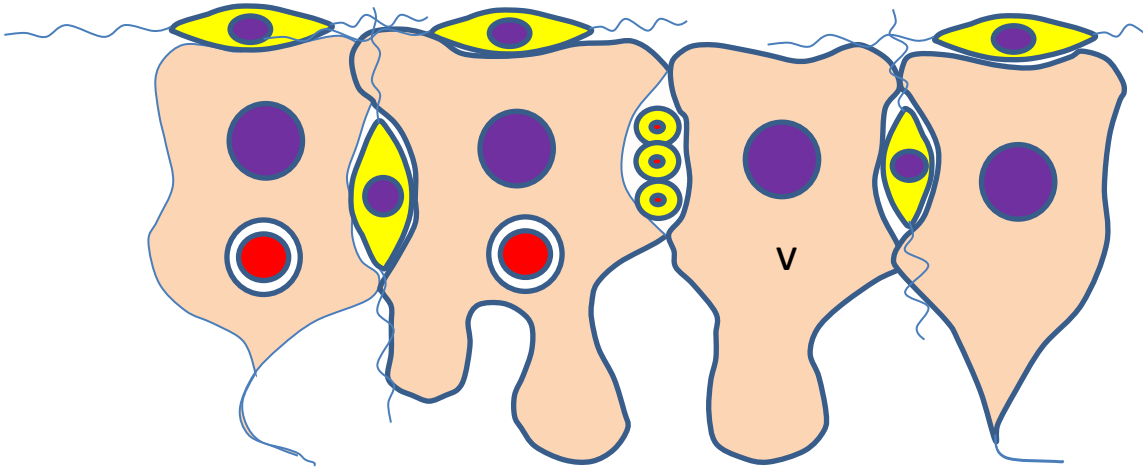

১। পুষ্টি কোষ বা পেশি আবরণী কোষ

(i) ফ্ল্যাজেলীয় কোষ ঃ এ কোষের মুক্ত প্রান্তে ১-৪টি সুতার মতো ফ্ল্যাজেলা থা

(ii) ক্ষণপদীয় কোষ ঃ এ কোষের মুক্ত প্রান্তে ক্ষণপদ থাকে।

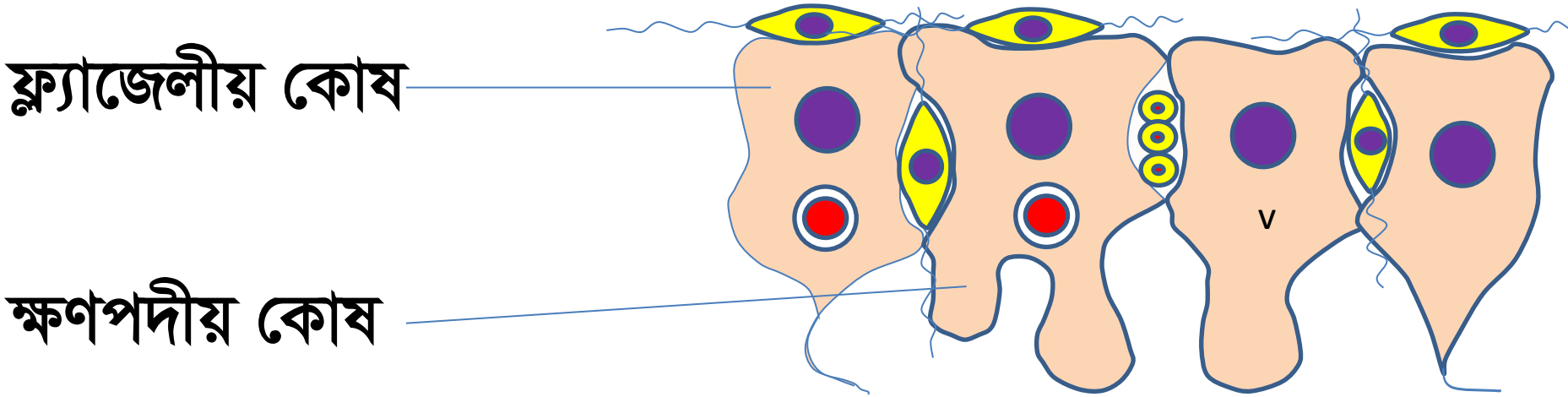

পুষ্টি কোষ বা পেশি আবরণী কোষের কাজ

১। ইহা সংকোচন- প্রসারণের মাধ্যমে দেহকে সরু ও মোটা করে
২। ফ্ল্যাজেলা খাদ্য বস্তুকে কণায় পরিনত করে
৩। ইহা মুখ ছিদ্রে পানি প্রবেশ করায়
৪। খাদ্যকে গলাধঃকরণ করে

২। গ্রন্থি কোষ

গ্রন্থি কোষ গুলো বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। ইহা মূলদেহ ও হাইপোস্টোমে সবচেয়ে বেশি থাকে। পাদচাকতিতে কম থাকে এবং কর্ষিকায় অনুপস্থিত। কোষ গুলো দেখতে নলাকার, দানাযুক্ত বা ডিম্বাকার হতে পারে। এতে মিউকাস গ্রন্থি, এনজাইম গ্রন্থি ও আঠালো রস নিঃসরণকারী গ্রন্থি থাকে।

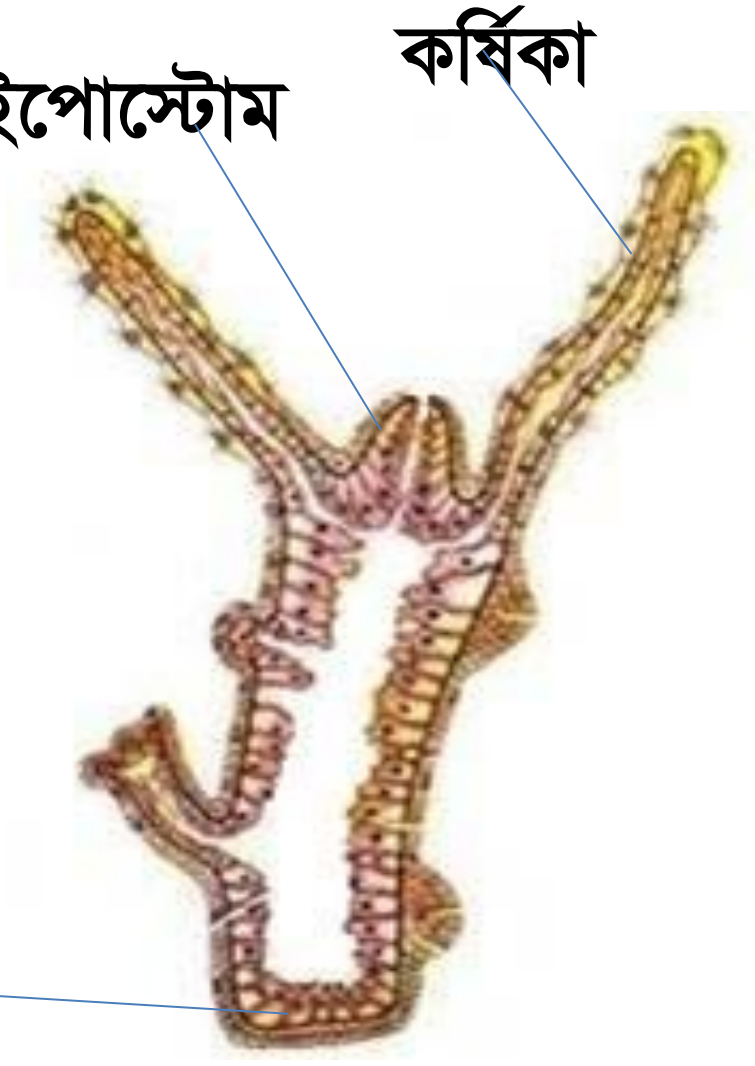

২। গ্রন্থি কোষ

(i) মিউকাস ক্ষরণকারী কোষ ঃ ইহা হাইপোস্টোম অঞ্চলে থাকে এবং মিউকাস ক্ষরণ করে।

(ii) এনজাইম ক্ষরণকারী কোষ ঃ এ কোষ থেকে নিঃসৃত এনজাইম খাদ্যপরিপাক করে।

গ্রন্থি কোষের কাজ

(i) এ কোষ খাদ্য গলাধঃকরণে সাহায্য করে

(ii) নিঃসৃত আঠালো রস হাইড্রাকে কোন বস্তুর সাথে আটকে রাখে

(iii) নিঃসৃত এনজাইম খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে

৩। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ

পেশি আবরণী কোষের মাঝখানে গুচ্ছাকারে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ অবস্থান করে। কোষ গুলো দেখতে গোলাকার, ডিম্বাকার বা ত্রিকোণাকার। প্রতিটি কোষে একটি নিউক্লিয়াস, অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, লাইসোজোম, রাইবোজোম প্রভৃতি থাকে। ইহা টটিপটেন্সি ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই অন্য যে কোন কোষে রুপান্তরিত হতে পারে।

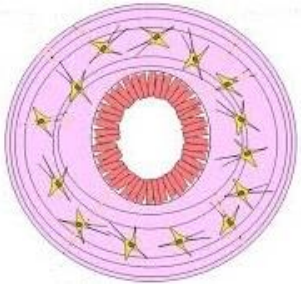

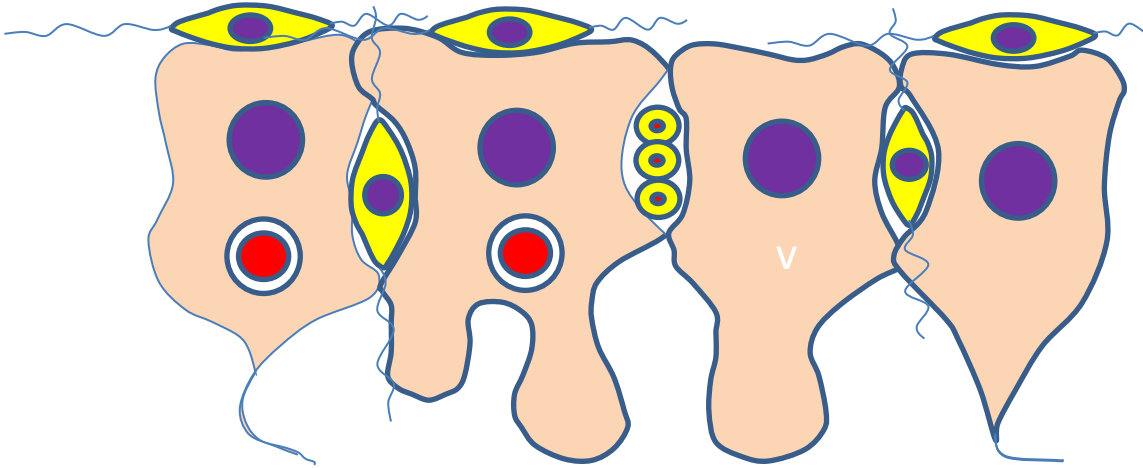

ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের কাজ

(i) এ কোষ অন্য যে কোন কোষে রুপান্তরিত হতে পারে

(ii) ইহা হাইড্রার পুনরুৎপত্তি, বৃদ্ধি, জননাঙ্গ ও মুকুল সৃষ্টিতে অংশ নেয়

(iii) ৪৫ দিন পর পর দেহ কোষ নষ্ট হয়ে গেলে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ সে স্থান পুরণ করে

৪। স্নায়ু কোষ

স্নায়ু কোষ গুলো গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থান করে। কোষ গুলো দেখতে মাকু আকৃতির বা বহুভুজাকার। কোষে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস বিদ্যমান।

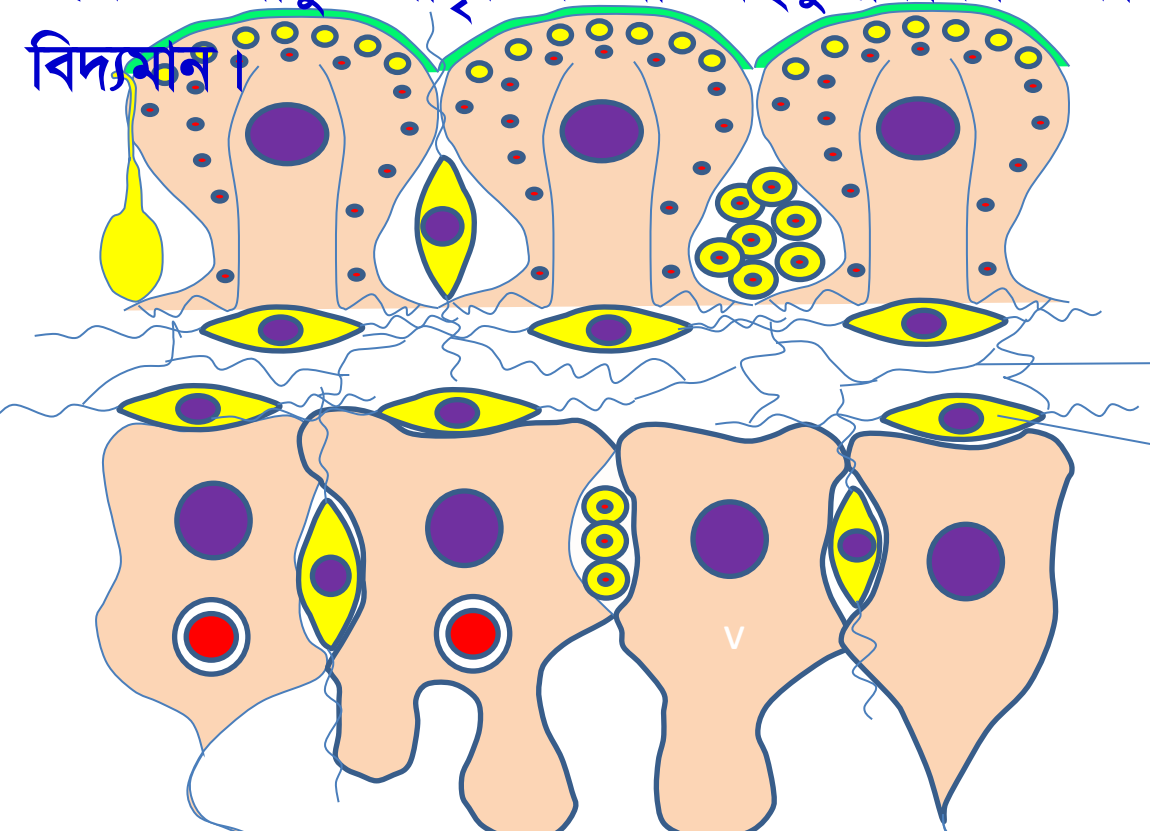

স্নায়ু জালক

স্নায়ু কোষ

৪। স্নায়ু কোষ

প্রতিটি কোষে দুই বা ততোধিক শাখাযুক্ত স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে। স্নায়ুতন্ত্র গুলো পরস্পর মিলিত হয়ে স্নায়ু জালিকা গঠন করে।

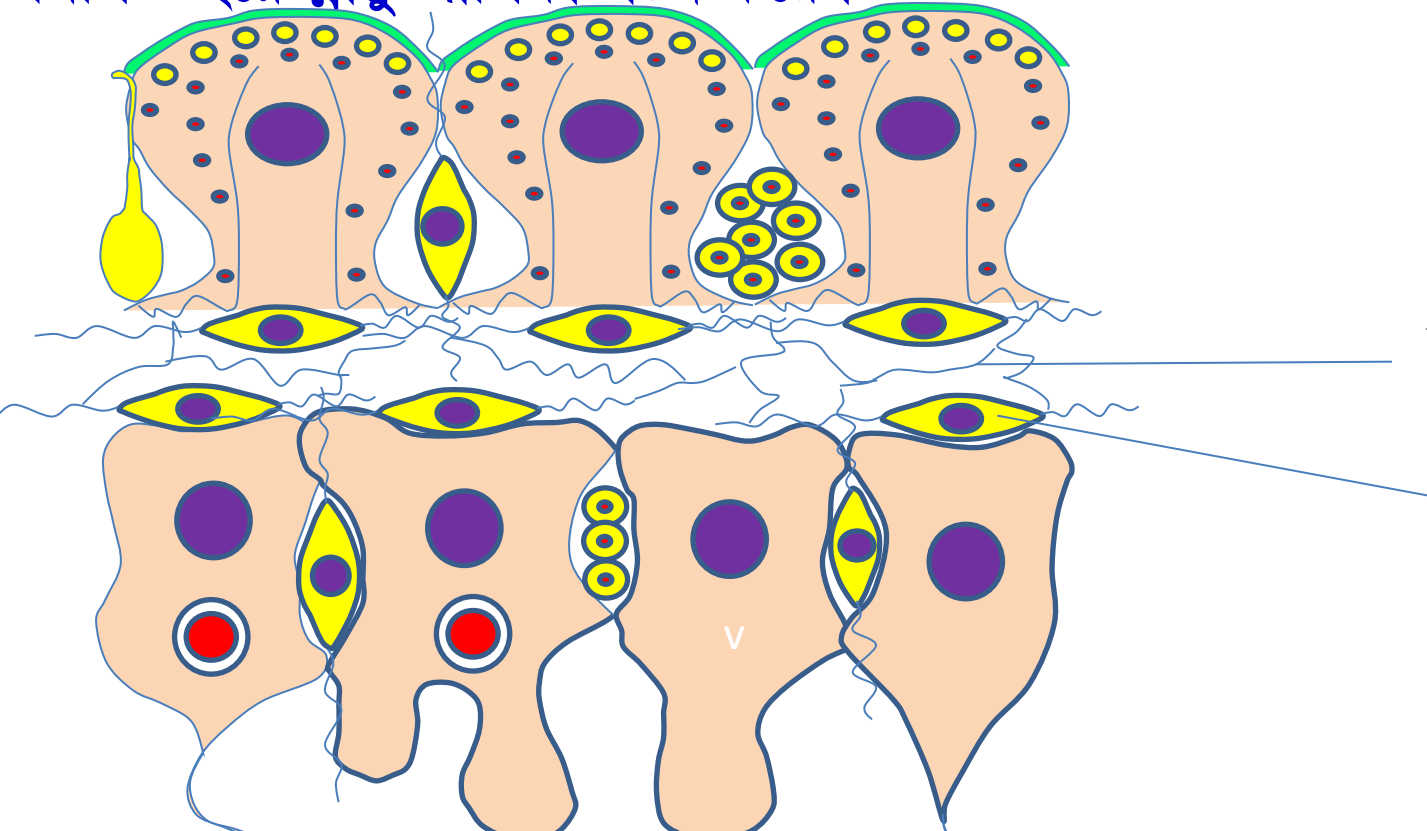

স্নায়ু কোষের কাজ

(i) ইহা সংবেদী কোষ হতে স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে প্রতিবেদন সৃষ্টি করে
(ii) ইহা বিভিন্ন কোষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে

৫। সংবেদী কোষ

পেশী আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে বিক্ষিপ্ত ভাবে সংবেদী কোষ অবস্থান করে। তবে কর্ষিকা, হাইপোস্টোম ও পদতলে অসংখ্য। কোষ গুলো দেখতে সরু, লম্বা ও মাকু আকৃতির। অর্থাৎ মধ্যভাগ প্রশস্ত এবং উভয় প্রান্ত সরু। প্রতিটি কোষে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে। কোষের মুক্ত প্রান্তের সংবেদী রোম সিলেন্টেরনে এবং মেসোগ্লিয়া সংলগ্ন রোম স্নায়ুতন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে।

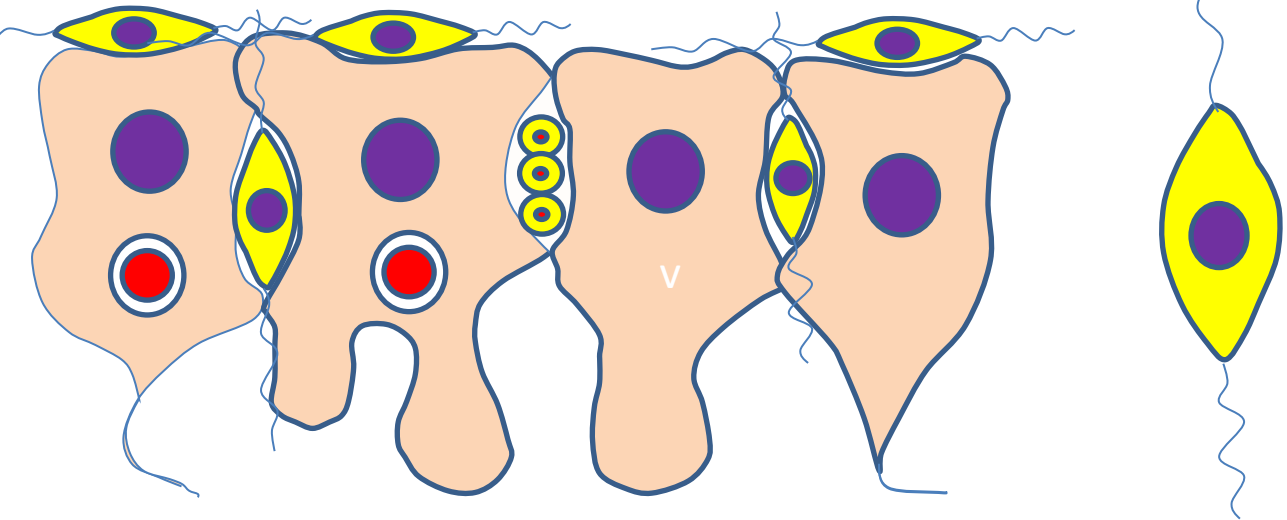

সংবেদী কোষের কাজ

(i) ইহা উদ্দীপনা গ্রহণ করে প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।

(ii) ইহা খাদ্য বস্তুর গুণাগুণ বাছাই করে

এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যে পার্থক্য

এপিডার্মিস	গ্যাস্ট্রোডার্মিস
১। ইহা এক্টোডার্ম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে	১। ইহা এন্ডোডার্ম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে
২। ইহা বাইরের দিকে অবস্থিত	২। ইহা ভিতরের দিকে অবস্থিত
৩। এতে ক্ষণপদ বা ফ্ল্যাজেলা থাকে না	৩। এতে ক্ষণপদ বা ফ্ল্যাজেলা থাকে
৪। এ স্তরে কিউটিকলের আবরণী থাকে	৪। এতে কিউটিকলের আবরণী থাকে না
৫। এ স্তরে নিডোসাইট কোষ থাকে	৫। এ স্তরে নিডোসাইট কোষ থাকে না
৬। ইহা জননাঙ্গ ও মুকুল সৃষ্টি করে	৬। ইহা জননাঙ্গ ও মুকুল সৃষ্টি কওে না
৭। ইহা আঘাত থেকে দেহকে রক্ষা করে	৭। ইহা পুষ্টির কাজে নিয়োজিত

নিডোব্লাস্ট বা নিডোসাইট কোষ

নিডোব্লাস্ট বা নিডোসাইটের চিত্র অঙ্কন

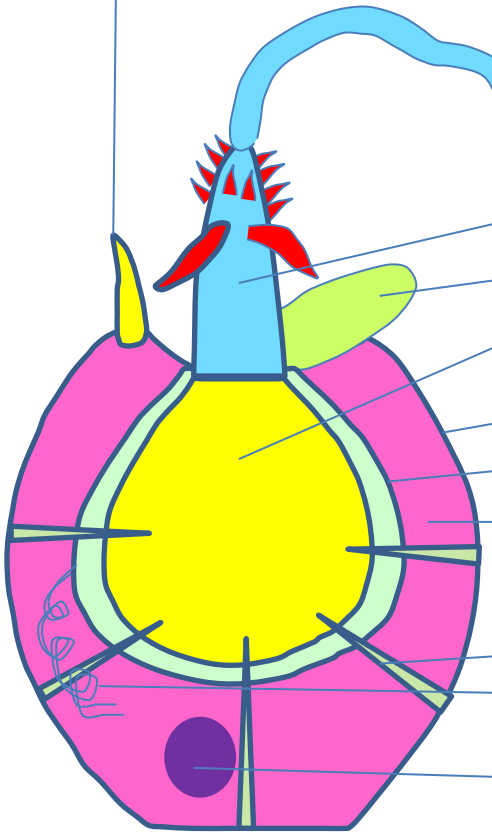

নিডোসিল

নেমাটোসিস্ট

অপারকুলাম

বহিঃআবরণী

অন্তঃআবরণী

সাইটোপ্লাজম

পেশি সূত্র

ল্যাসো

নিউক্লিয়াস

গ্রীক শব্দ knide অর্থ nettle এবং blastos অর্থ germ নিয়ে Cnidoblast শব্দটি গঠিত।

হাইড্রার বহিঃত্বকে কলসি বা ফ্ল্যাক্স আকৃতির যে কোষ থাকে তাকে নিডোব্লাস্ট কোষ বলে। পদতল ছাড়া দেহের সর্বত্র নিডোব্লাস্ট কোষ থাকে। তবে কর্ষিকায় এর সংখ্যা অধিক। কখনো কখনো কোষগুলো গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এদের গুচ্ছকে ব্যাটারী (battery) বলে।

আদর্শ নিডোব্লাস্ট

১। আবরণী

২। নেমাটোসিস্ট

৩। অপারকুলাম

৪। নিডোসিল

৫। পেশিসূত্র ও ল্যাসো

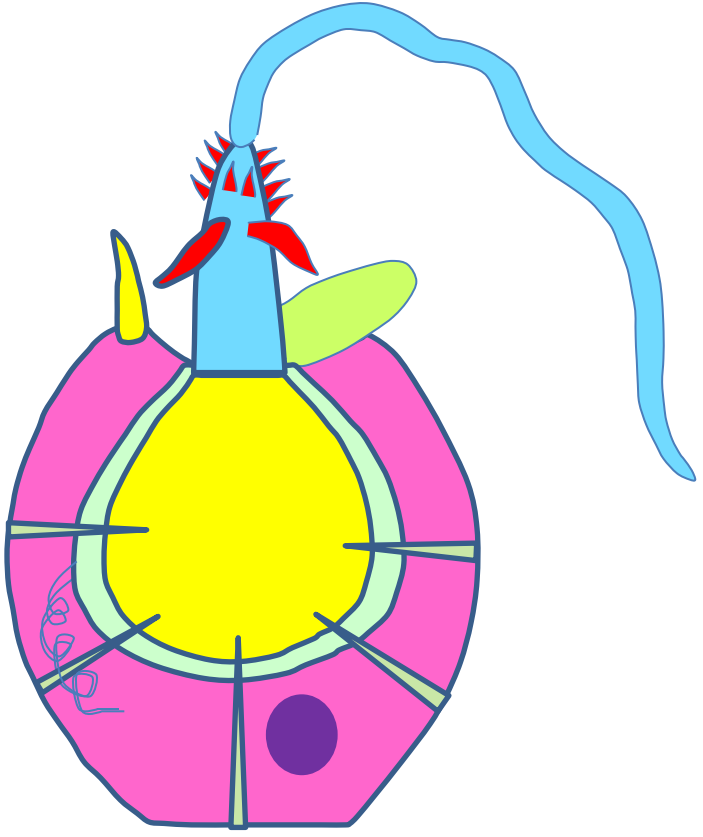

১। আবরণী

প্রতিটি নিডোব্লাস্ট কোষ দ্বি-স্তরবিশিষ্ট একটি আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। বহিঃআবরণী ও অন্তঃআবরণী। বাইরের আবরণীকে বহিঃআবরণী এবং ভিতরের আবরণীকে অন্তঃআবরণী বলে। ইহা প্রোটিন ও লিপিড বা লিপোপ্রোটিন দ্বারা গঠিত। আবরণী দু'টির মাঝখানে দানাদার সাইটোপ্লাজম, একটি নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, লাইসোজোম, রাইবোজোম প্রভৃতি থাকে। এর ভিতরে নেমাটোসিস্টের ক্যাপসুল বা থলে অবস্থান করে।

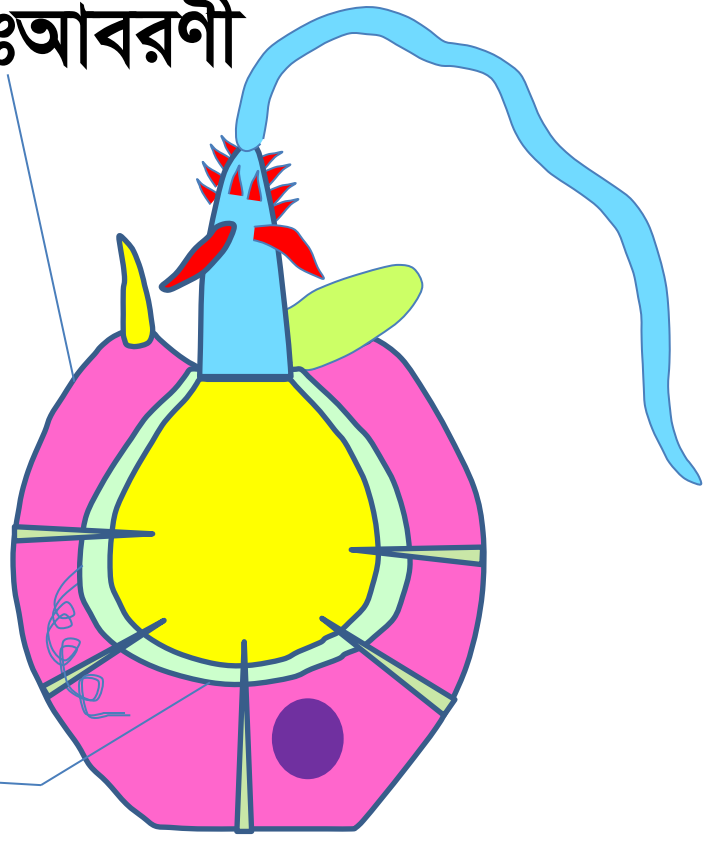

২। নেমাটোসিস্ট

নিডোব্লাস্টকোষে প্যাচানো সুত্রকসহ ক্ষুদ্র থলিকে নেমাটোসিস্ট বা নিডা বলে। নেমাটোসিস্টের থলীকে ক্যাপসুল বলা হয়। ক্যাপসুল হিপনোটক্সিন (প্রোটিন ও ফেনল) নামক বিষাক্ত তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। নেমাটোসিস্টের অগ্রভাগে শক্ত ও প্রশস্ত বাট (shaft) থাকে। বাটে বড় বড় তিনটি কাঁটা থাকে। একে বার্ব (barb) বলে।

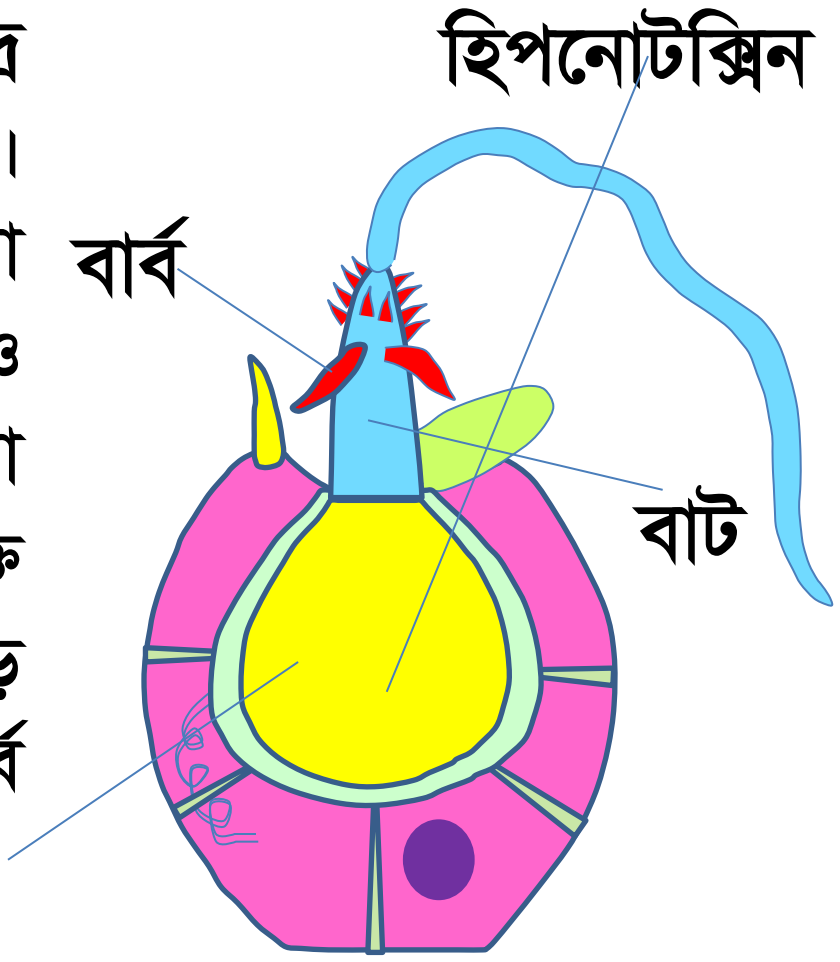

২। নেমাটোসিস্ট

বাটে সর্পিলাকারে তিন সারি ছোট ছোট থাকে। একে বার্বিউল **(barbule)** বলে। বাটের অগ্রভাগে সরু, লম্বা, নলাকার ও ফাঁপা সূত্রক থাকে। সূত্রকের অগ্রভাগ উন্মুক্ত থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি বাট ও কাঁটাসহ থলী বা ক্যাপসুলের ভিতর ঢুকানো থাকে। একটি নেমাটোসিস্ট একবার নিক্ষিপ্ত হলে আর কখনো ভিতরে প্রবেশ করে না।

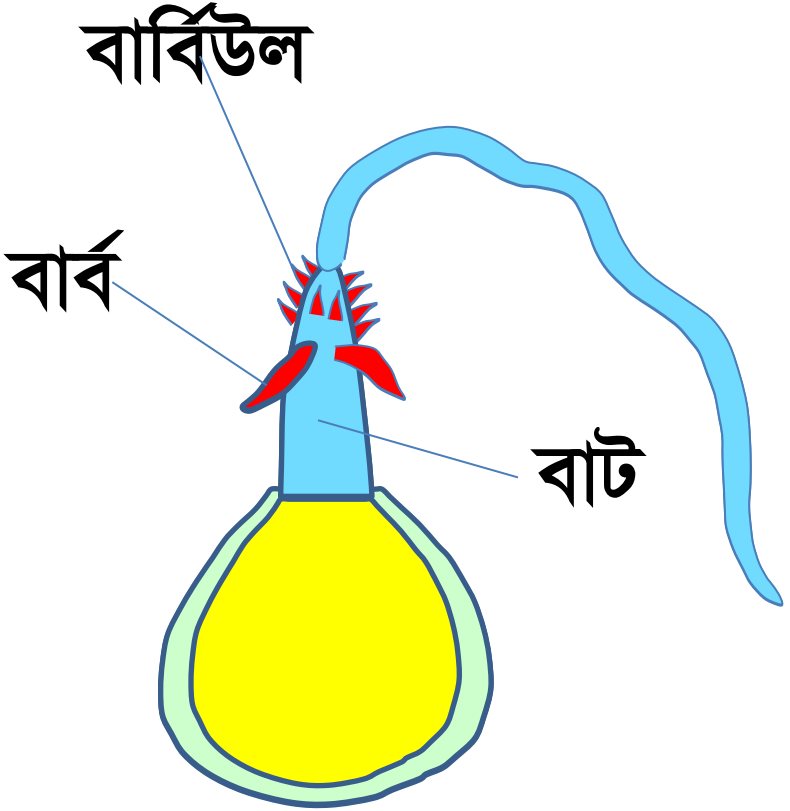

৩। অপারকুলাম

নেমাটোসিস্টের মুখে ঢাকনার মতো একটি অংশ থাকে। একে অপারকুলাম বলে। ইহা একটি রুপান্তরিত সিলিয়াম। ইহা নেমাটোসিস্টের মুখ খোলা ও বন্ধ হওয়ার কাজ করে।

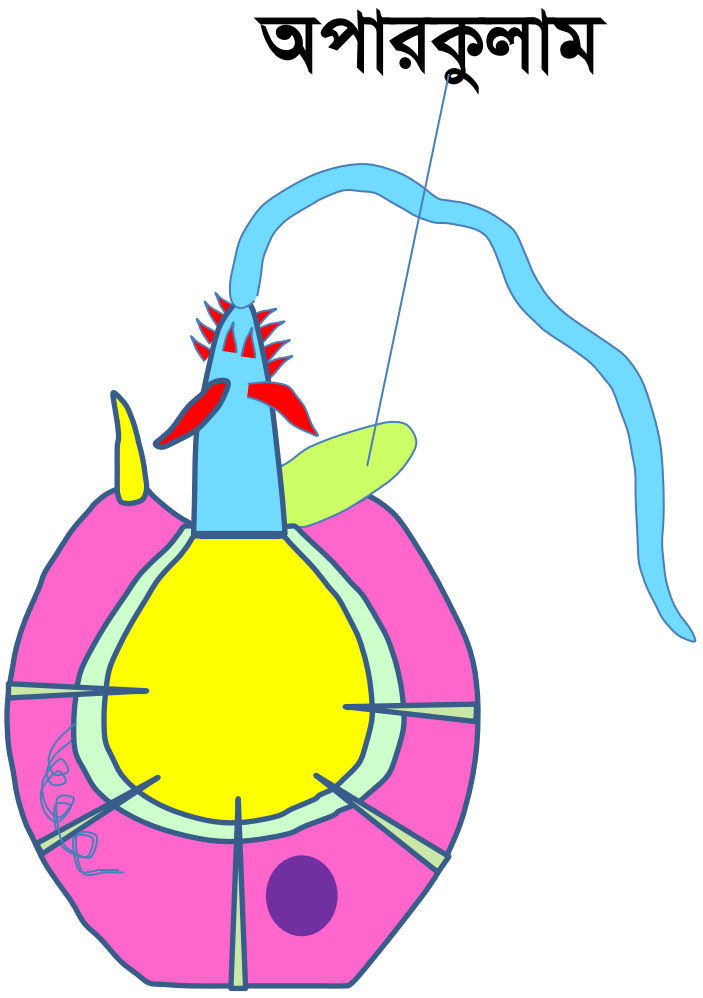

৪। নিডোসিল

নিডোসাইট কোষের মুক্ত প্রান্তে শক্ত, দৃঢ়, ক্ষুদ্র ও অতিসংবেদনশীল একটি ফাঁপা কাঁটা থাকে। একে নিডোসিল বলে। শিকার নিডোসিলকে স্পর্শ করলে বা চাপ দিলে অপাকুলাম খুলে যায়। নিডোসিল ট্রিগারের মতো কাজ করে। ফলে প্যাচানো সূত্রক বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

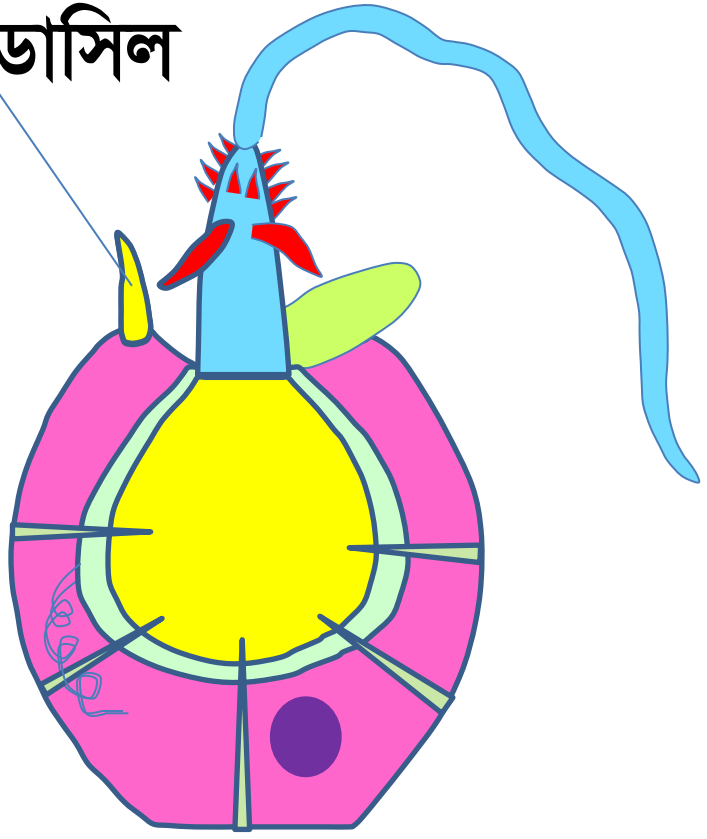

৫। পেশিসূত্র ও ল্যাসো

নেমাটোসিস্টের নিম্ন প্রান্ত হতে কতক গুলো পেশী সূত্র নির্গত হয়। এছাড়া নিম্ন প্রান্তে ল্যাসো নামক একটি প্যাচানো সুতা থাকে।

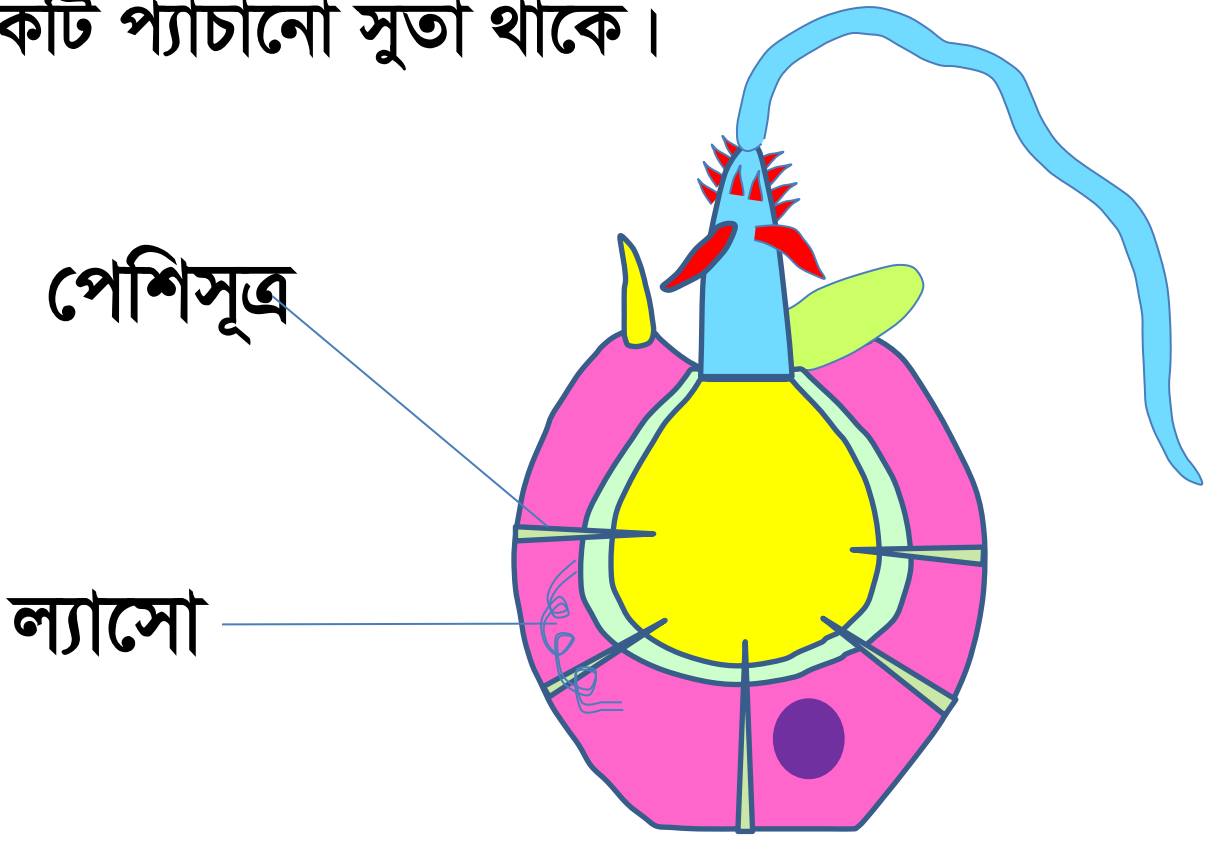

নিডোব্লাস্টের কাজ

১। আত্মরক্ষা ঃ নেমাটোসিস্টের ভিতরে হিপনোটক্সিন নামক বিষাক্ত পদার্থ থাকে। হাইড্রা এই বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা আত্মরক্ষা করে।

২। শিকার ধরা ঃ নেমাটোসিস্টের সূত্রক দ্বারা হাইড্রা খাদ্যকে আকড়ে ধরে

৩। চলন ঃ নিমাটোসিস্ট কোষ হাইড্রাকে চলনে সাহায্য করে।

৪। দেহকে আটকে রাখা ঃ নেমাটোসিস্ট আঠালো পদার্থ ক্ষরণ করে । ইহা দ্বারা হাইড্রা কোন বস্তুর সাথে আটকে থাকে।

সিলেন্টেরন

Coelenteron

নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের দেহগহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। হাইড্রার দেহগহ্বর হলো সিলেন্টেরন। আর্কেন্টেরন রুপান্তরিত হয়ে সিলেন্টেরন সৃষ্টি হয়। ইহা গ্যাস্ট্রোডার্মিস দ্বারা আবৃত থাকে। এতে বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটে। এর মধ্য দিয়ে খাদ্যসার ও রেচন পদার্থ পরিবাহিত হয়। তাই একে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বা পরিপাক সংবহন গহ্বর বলা হয়।

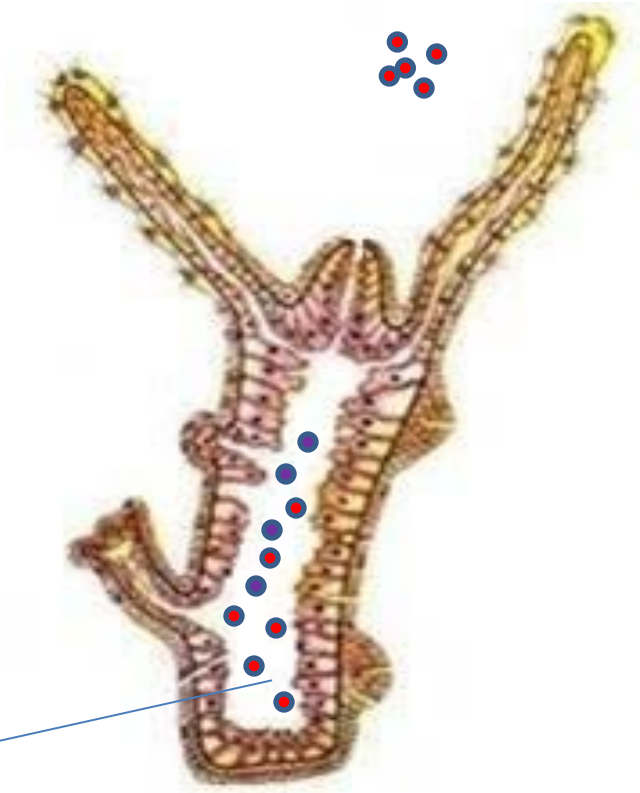

সিলেন্টেরন

সিলেন্টেরনকে অনেক সময় ব্লাইন্ড গাট বা ব্লাইন্ড স্যাক বলা হয়। মুখছিদ্রের মাধ্যমে ইহা বাইরে উন্মুক্ত হয়। মুখছিদ্র দ্বারা খাদ্য গ্রহণ ও বর্জ্য ত্যাগ করে।

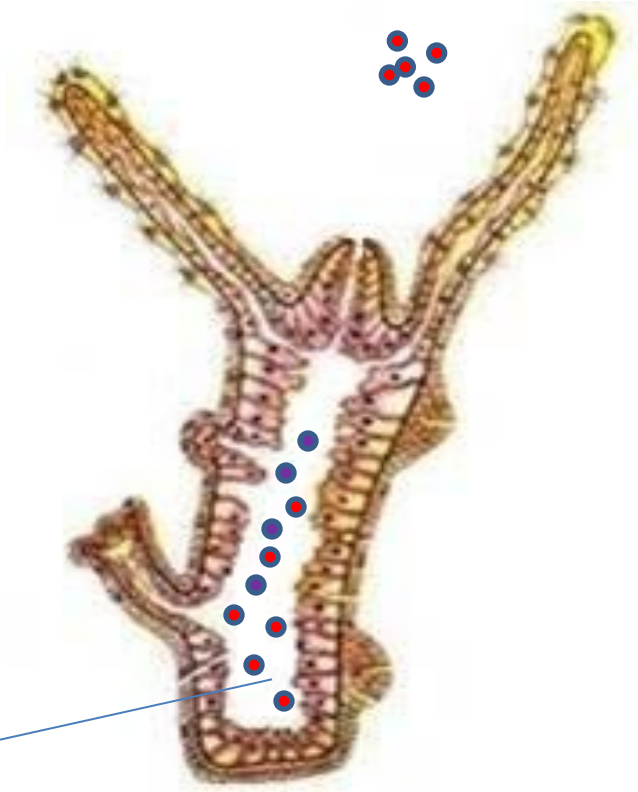

সিলেন্টেরন

সিলেন্টেরনের গুরুত্ব

১। ইহা খাদ্য ধারণ করে

২। ইহা বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটায়।

৩। এর মধ্য দিয়ে খাদ্যসার ও রেচন পদার্থ পরিবাহিত হয়

৪। ইহা মুখছিদ্র দ্বারা বর্জ্য ত্যাগ করে।

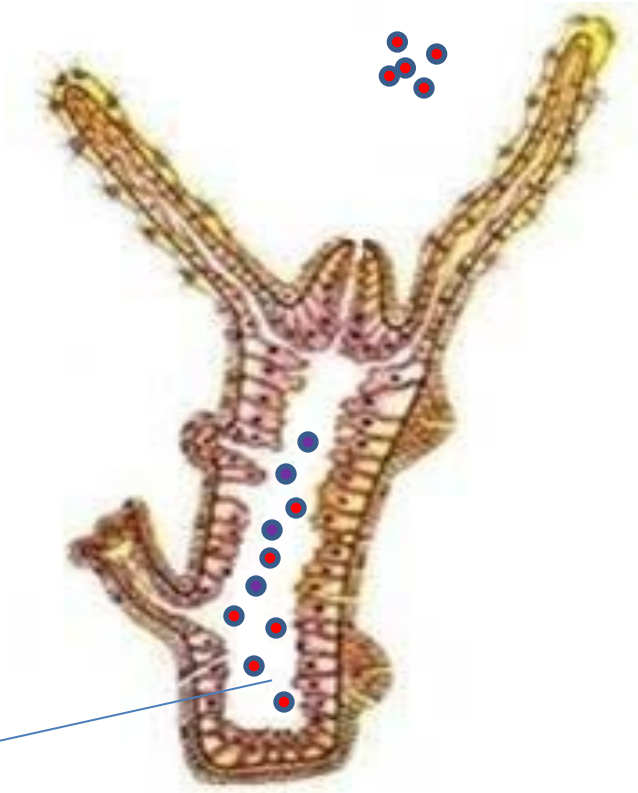

সিলেন্টেরন

সিলোম ও সিলেন্টেরনের মধ্যে পার্থক্য

সিলোম	সিলেন্টেরন
১। ট্রিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণীদের দেহগহ্বর	১। ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণীদের দেহগহ্বর
২। পেরিটোনিয়াম আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে	২। গ্যাস্ট্রোডার্মিস দ্বারা আবৃত থাকে
৩। সিলোমিক রস দ্বারা পূর্ণ থাকে	৩। পানি, খাদ্য ও বর্জ্য দ্বারা পূর্ণ থাকে
৪। এতে বিভিন্ন ধরণের অঙ্গ থাকে	৪। এতে কোন অঙ্গ থাকে না
৫। এটি দেহগহ্বরের কাজ করে	৫। এটি দেহগহ্বর ও পরিপাক কাজ করে
৬। ইহা বন্ধ গহ্বর	৬। এর এক মুখ খোলা
৭। মেসোডার্ম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে	৭। আর্কেন্টেরনের রুপান্তরে সৃষ্টি হয়
৮। হাইড্রোস্ট্যাটিক কঙ্কাল হিসেবে কাজ করে	৮। হাইড্রোস্ট্যাটিক কঙ্কাল হিসেবে কাজ করে না
৯। বিভিন্ন অঙ্গকে স্বাধীনভাবে বৃদ্ধিতে সাহায্য করে	৯। পরিপাকে সাহায্য করে

হাইড্রার নেমাটোসিস্ট

নিডোসাইট কোষে অবস্থিত প্যাচানো সূত্রকসহ ক্ষুদ্র থলীকে নেমাটোসিস্ট বলে। ১৯৬৫ সালে বিজ্ঞানী ভার্নার নিডেরিয়া জাতীয় প্রাণীদের দেহে ২৩ ধরনের নেমাটোসিস্ট শনাক্ত করেছেন।

হাইড্রাতে চার প্রকার নেমাটোসিস্ট দেখা যায়।

১। স্টিনোটিল বা পেনিট্র্যান্ট

২। স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট বা হলোট্রাইকাস আইসোরাইজা

৩। স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট বা অ্যাট্রাইকাস আইসোরাইজা

৪। ভলভেন্ট বা ডেসমোনিম

১। স্টিনোটিল বা পেনিট্র্যান্ট

হাইড্রার চার ধরনের নেমাটোসিস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো স্টিনোটিল। স্টিনোটিলের ক্যাপসুলে হিপনোটক্সিন নামক বিষাক্ত তরল পদার্থ থাকে। এর অগ্রভাগে শক্ত ও প্রশস্ত বাট থাকে। বাটে বার্ব নামক বড় বড় তিনটি কাঁটা থাকে। বাটে সর্পিলাকারে তিন সারি ছোট ছোট বার্বিউল থাকে। বাটের অগ্রভাগে সরু, লম্বা, নলাকার ও ফাঁপা সূত্রক থাকে। সূত্রকের অগ্রভাগ উন্মুক্ত থাকে।

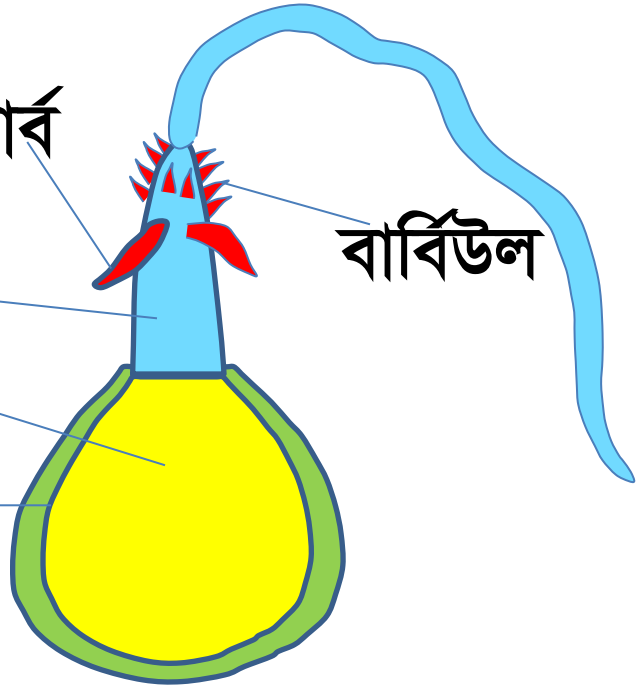

স্টিনোটিল বা পেনিট্র্যান্টের কাজ

(i) এর সূত্রক শিকারকে আঁকড়ে ধরে

(ii) ইহা হিপনোটক্সিন দ্বারা শিকারকে অবশ করে

২। ভলভেন্ট বা ডেসমোনিম ঃ ভলভেন্ট হলো অপেক্ষাকৃত ছোট নেমাটোসিস্ট। ইহা দেখতে নাসপাতি আকৃতির। এর বাটে বার্ব ও বার্বিউল থাকে না। এর সূত্রকটি মোটা, খাটো, স্থিতিস্থাপক ও কাঁটাবিহীন। সূত্রকের শীর্ষদেশ বন্ধ। ক্যাপসুলের ভিতরে সূত্রকের একটি মাত্র প্যাচ থাকে। নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে
সাথে কর্ক-স্ক্রর মতো অনেক গুলো প্যাচ সৃষ্টি হয়।

ভলভেন্টের কাজ

(i) ইহা শিকারকে জড়িয়ে ধরে

(ii) ইহা চলনে সাহায্য করে

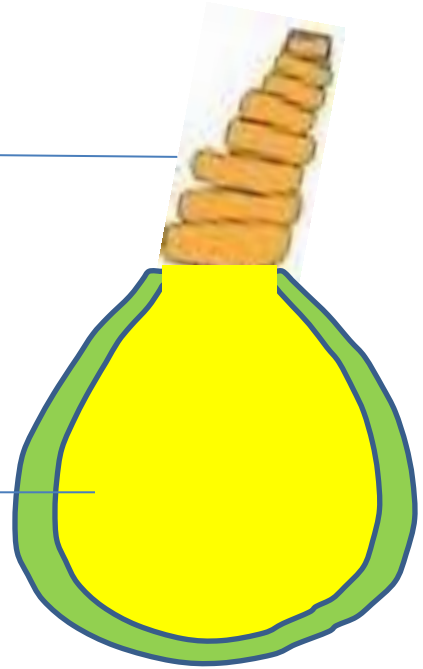

৩। স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট বা হলোট্রাইকাস আইসোরাইজা ঃ স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট মাঝারী ধরনের নেমাটোসিস্ট। এর ক্যাপসুল ছোট এবং বাট সুগঠিত নয়। এতে বার্ব নাই, তবে বার্বিউল থাকে। এর সূত্রক লম্বা, কাঁটাযুক্ত এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত।

কাজ

(i) ইহা শিকারকে প্যাচিয়ে ধরে,

(ii) চলনে সাহায্য করে,

(iii) আঠালো পদার্থ ক্ষরণ করে

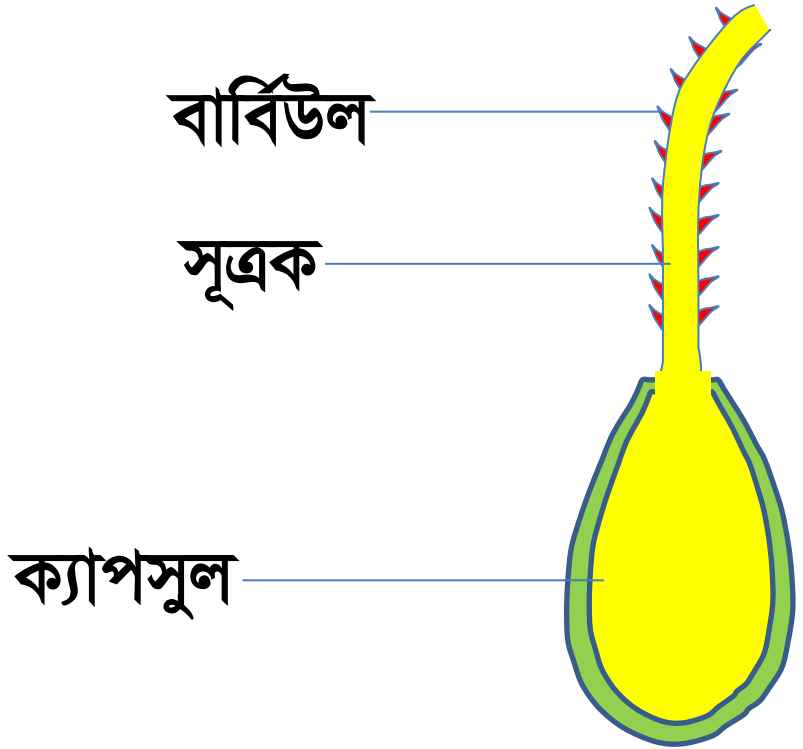

৪। স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট বা অ্যাট্রাইকাস আইসোরাইজা ঃ স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট হলো ক্ষুদ্রতম নেমাটোসিস্ট। এদের বাট সুগঠিত নয়। বার্ব ও বার্বিউল থাকে না। এর সূত্রক ছোট, কাঁটাবিহীন এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত।

স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্টের কাজ

(i) ইহা চলনে সাহায্য করে

(ii) হাইড্রাকে কোন বস্তুর সাথে আটকে রাখে

(iii) আঠালো পদার্থ ক্ষরণ করে

(iv) শিকারকে আটকে ধরে

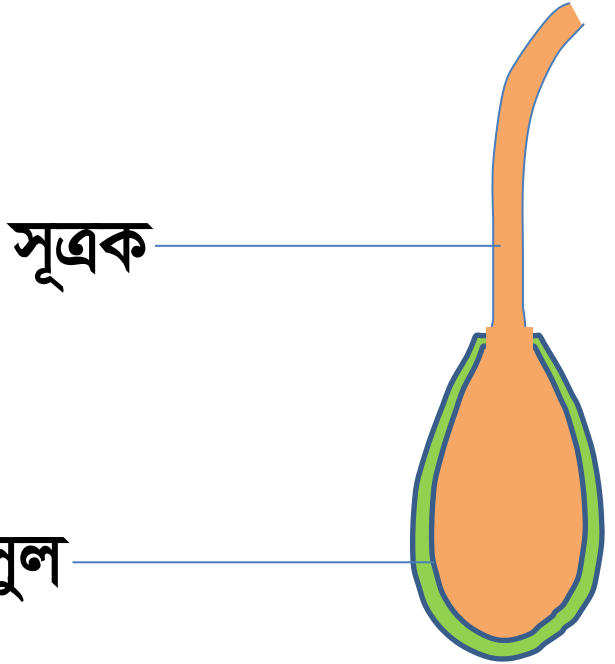

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপের কৌশল

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপের কৌশল

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ একটি রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। কোন শিকার হাইড্রার কর্ষিকার নিকটবর্তী হলে সূত্রক নিক্ষিপ্তকরণ শুরু হয়। শিকারের দেহের রাসায়নিক পদার্থের কারণে হাইড্রার নেমাটোসিস্টের প্রাচীরের পানি ভেদ্যতা বেড়ে যায়। এ সময় শিকার নিডোসিল স্পর্শ করা মাত্রই অপারকুলাম খুলে যায়। অপারকুলাম খুলে গেলে পানি দ্রুত ক্যাপসুলে প্রবেশ করে। ক্যাপসুলের অভিস্রবণিক চাপ বা হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ বেড়ে যায় এবং সূত্রক ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি মাত্র ৩ মিলি সেকেন্ডে ঘটে

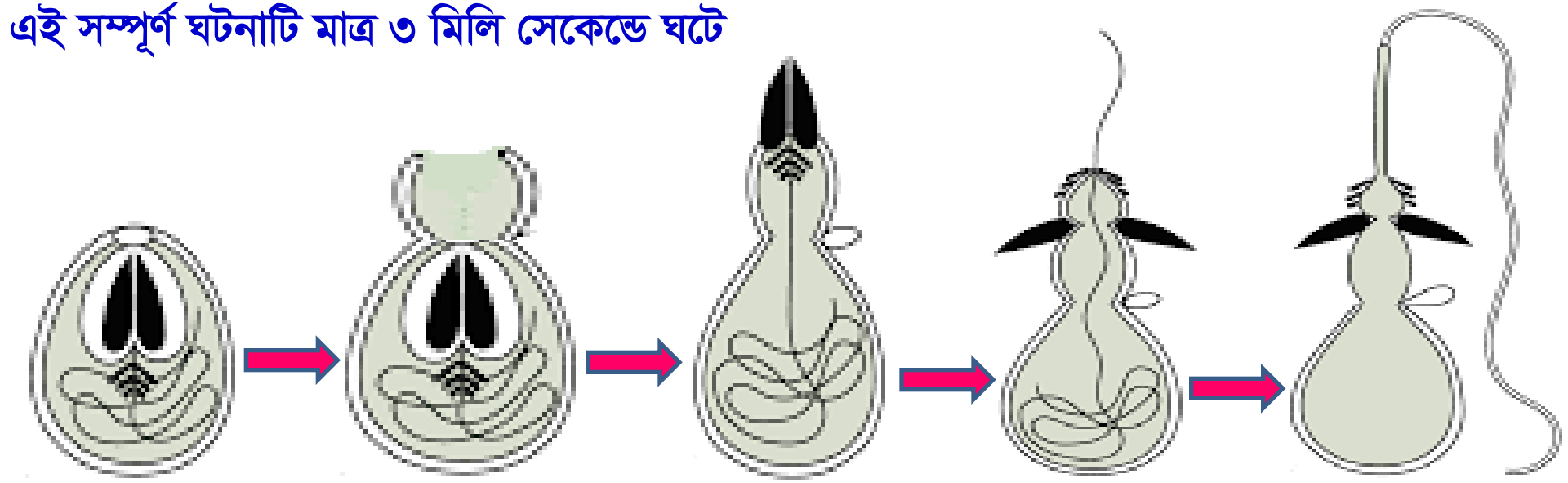

নেমাটোসিস্টের সূত্রক একবার নিক্ষিপ্ত হলে সেটি আর নিডোসাইটে ফিরিয়ে আনা যায় না। অর্থাৎ একবার নিক্ষিপ্ত হলে আর ব্যবহার করা যায় না। ঐ একই নিডোসাইটে আর কোন নেমাটোসিস্ট সৃষ্টি হয় না। এ ধরণের নিডোসাইট ধীরে ধীরে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলারে প্রবেশ করে এবং খাদ্যবস্তুর সাথে মিশে হজম হয়ে যায়। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নতুন নিডোসাইট সৃষ্টি হয় এবং ব্যবহার হয়।

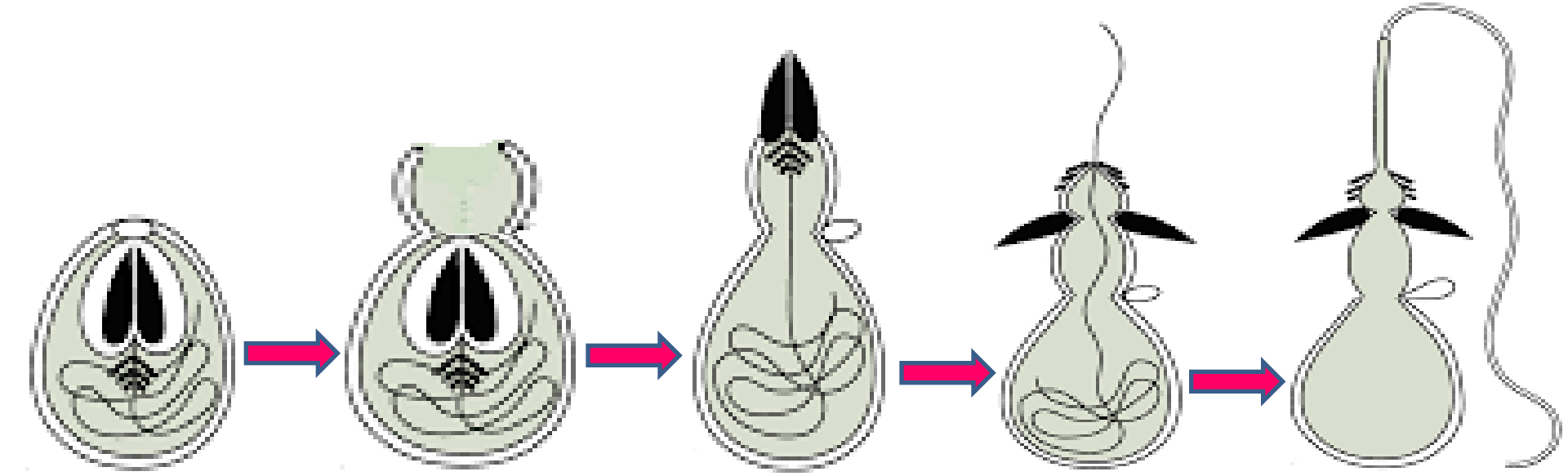

হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া
হাইড্রার শিকার ধরার কৌশল

হাইড্রা মাংসাশী (carnivorous) প্রাণী। পতঙ্গের লার্ভা, সাইক্লপস, ড্যাফনিয়া/ক্রাস্টাসিয়া, ছোট কৃমি, অ্যানিলিড, মাছের ডিম, ব্যাঙাচি প্রভৃতি হাইড্রার খাদ্য। তবে প্রধান খাদ্য হলো ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী। প্রাণীর কলারসে গ্লুটাথিওন নামক এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা অন্য প্রাণীকে শিকারে প্রলুব্ধ করে। হাইড্রা কেবল সেসব প্রাণীকে শিকার করে যাদের কলারসে গ্লুটাথিওন থাকে।

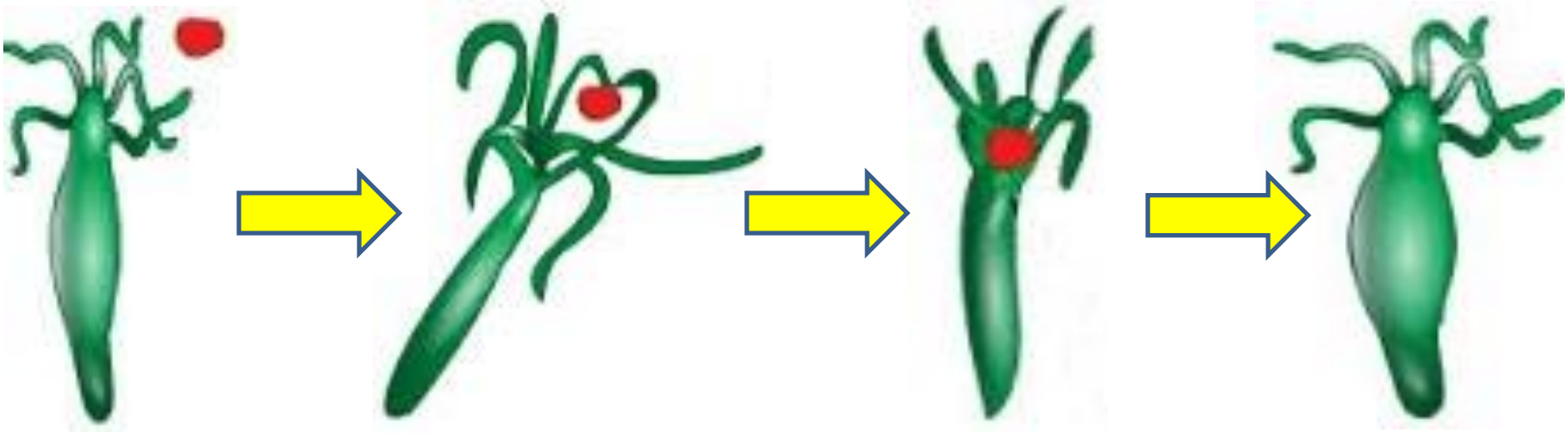

ক্ষুধার্ত হাইড্রা শিকার ধরার জন্য দেহ ও কর্ষিকা ভাসিয়ে দেয়। কোন শিকার হাইড্রার কর্ষিকার নিকটবর্তী হলে সূত্রক নিক্ষিপ্তকরণ শুরু হয়। শিকারের দেহের রাসায়নিক পদার্থের কারণে হাইড্রার নেমাটোসিস্টের প্রাচীরের পানি ভেদ্যতা বেড়ে যায়। এ সময় শিকার নিডোসিল স্পর্শ করা মাত্রই অপারকুলাম খুলে যায়। অপারকুলাম খুলে গেলে পানি দ্রুত ক্যাপসুলে প্রবেশ করে। ক্যাপসুলের অভিস্রবণিক চাপ বা হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ বেড়ে যায় এবং সূত্রক ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

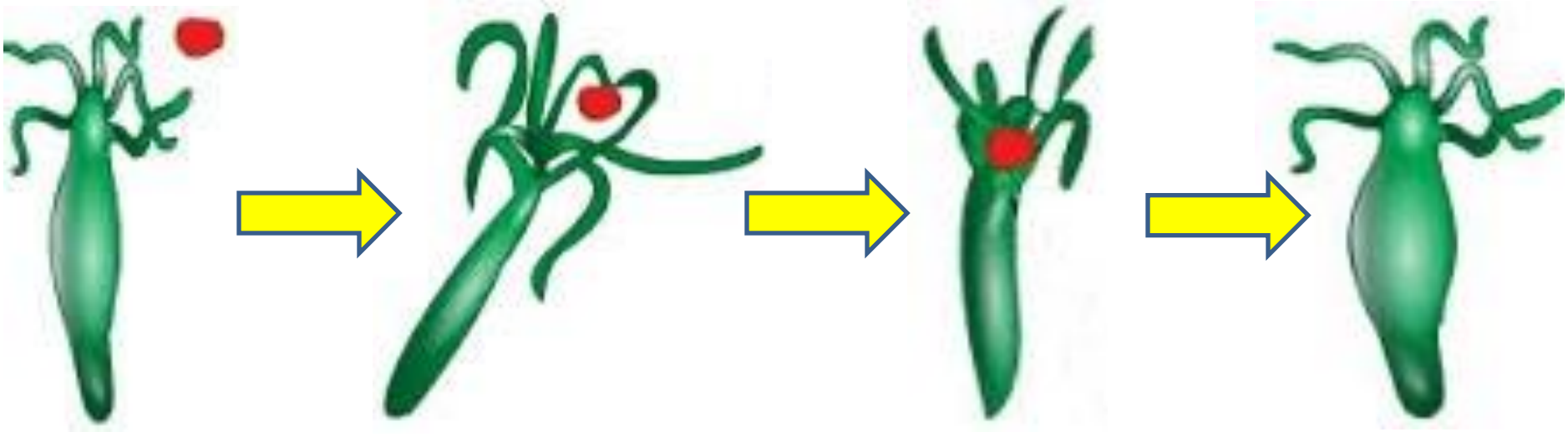

ভলভেন্টের সূত্রক শিকারের উপাঙ্গ জড়িয়ে গতিরোধ করে। গ্লুটিন্যান্ট গুলো আঠলো রস ক্ষরণ করে শিকারকে আটকে ফেলে। স্টিনোটিল নেমাটোসিস্ট শিকারের দেহে হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে দেয়। এতে শিকার অবশ হয়ে যায়। এরপর কর্ষিকা খাদ্যটিকে মুখছিদ্রের কাছে নিয়ে আসে। মুখছিদ্র স্ফীত ও চওড়া হয়ে খাদ্য গ্রহণ করে। মিউকাস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত মিউকাস খাদ্যকে সিক্ত ও পিচ্ছিল করে। হাইপোস্টোম ও দেহপ্রাচীরের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্য সিলেন্টেরনে পৌছে।

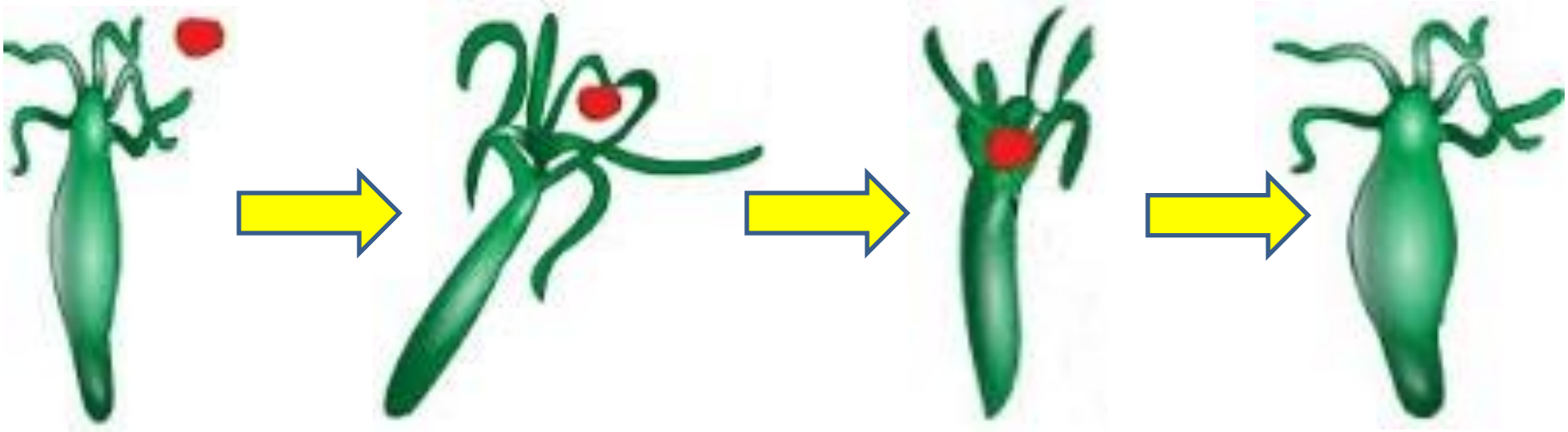

হাইড্রার খাদ্য পরিপাক

হাইড্রা প্রোটিন, স্নেহ ও সরল শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে। এরা স্টার্চ বা জটিল শর্করা পরিপাক করতে পারে না। খাদ্যের অপরিপাককৃত অংশ মুখছিদ্র দিয়ে বের হয়ে আসে। ***Hydra***-র খাদ্য পরিপাক দুইটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। যথা-

১। বহিঃকোষীয় পরিপাক

২। অন্তঃকোষীয় পরিপাক

১। বহিঃকোষীয় পরিপাক

যে প্রক্রিয়ায় কোষের বাইরে পাকস্থলী, পৌষ্টিকনালি ও সিলেন্টেরণের ভিতরে খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় তাকে বহিঃকোষীয় পরিপাক বলে। খাদ্যবস্তু সিলেন্টেরণে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। এনজাইমের প্রভাবে শিকার বা খাদ্য মারা যায়। দেহ প্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণের ফলে শিকারটি ছোট ছোট কণায় পরিনত হয়। গ্রন্থি কোষ হতে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্য পরিপাক হয়। প্রোটিন ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিনত হয়। এখানে লিপিড জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় না।

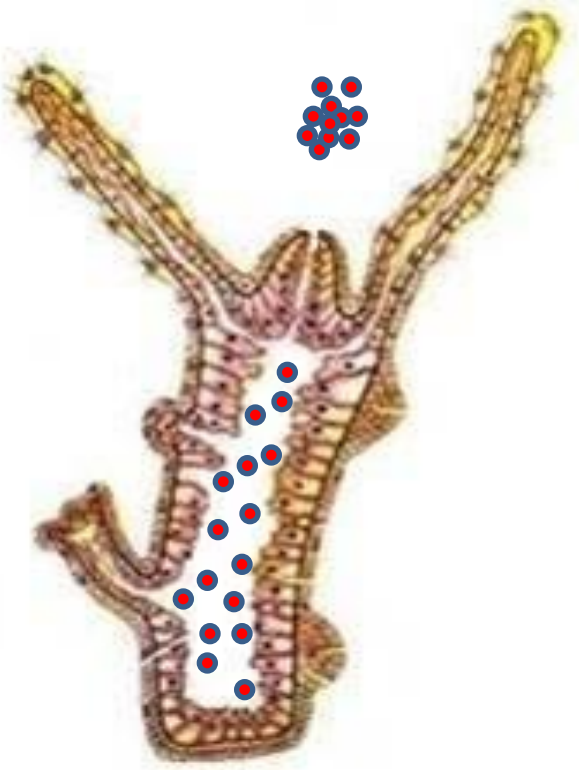

২। অন্তঃকোষীয় পরিপাক

যে প্রক্রিয়ায় কোষের সাইটোপ্লাজমের ভিতরে খাদ্য গহ্বরে খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় তাকে অন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে।

সিলেন্টেরনে আংশিক পাচিত খাদ্য কণা গুলো দেহের সংকোচন-প্রসারণের ফলে আরও ক্ষুদ্র কণায় পরিনত হয়। ক্ষণপদের সাহায্যে কিছু খাদ্য কণা তরলে পরিনত হয়। এরপর খাদ্য কণা গুলো সাইটোপ্লাজমের খাদ্য গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ করে। সাইটোপ্লাজম হতে নিঃসৃত এনজাইম খাদ্যকে পরিপাক করে। খাদ্য প্রথমে আম্লিক এবং পরে ক্ষারীয় পর্যায়ে পরিপাক হয়। প্রোটিন ভেঙ্গে অ্যামাইনো এসিডে এবং লিপিড ভেঙ্গে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিনত হয়।

অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাকের মধ্যে পার্থক্য

অন্তঃকোষীয় পরিপাক	বহিঃকোষীয় পরিপাক
১। কোষের ভিতরে খাদ্য পরিপাক হয়	১। সিলেন্টেরন ও পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক হয়
২। খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি হয়	২। খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি হয় না
৩। অন্তঃকোষীয় এনজাইম ব্যবহার হয়	৩। বহিঃকোষীয় এনজাইম ব্যবহার হয়
৪। খাদ্যসার সাইটোপ্লাজমে শোষিত হয়	৪। খাদ্যসার শোষিত হয় না
৫। খাদ্যসার পরিবাহিত হয় না	৫। খাদ্যসার পরিবাহিত হয়
৬। অপাচ্য বর্জ্য কোষরসে থাকে	৬। অপাচ্য বর্জ্য নালি পথে বের হয়

হাইড্রার যৌনজনন প্রক্রিয়া

যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জাইগোট সৃষ্টি হয় তাকে যৌনজনন বলে । হাইড্রার যৌনজনন ৩টি ধাপে সম্পন্ন হয়

১। গ্যামিটোজেনেসিস
২। নিষেক
৩। পরিস্ফুটন

১। গ্যামিটোজেনেসিস বা জননকোষ সৃষ্টি ঃ যে প্রক্রিয়ায় গ্যামিট তথা শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় তাকে গ্যামিটোজেনেসিস বলে।

ইহা দু'প্রকার

(i) স্পার্মাটোজেনেসিস

(ii) উওজেনেসিস

(i) স্পার্মাটোজেনেসিস ঃ যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তাকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে। হাইড্রার দেহের উপরের দিকে এপিডার্মাল ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভাজিত হয়ে এক বা একাধিক শুক্রাশয় গঠন করে। শুক্রাশয় দেখতে মোচাকার। এর শীর্ষে একটি বোঁটা বা নিপল

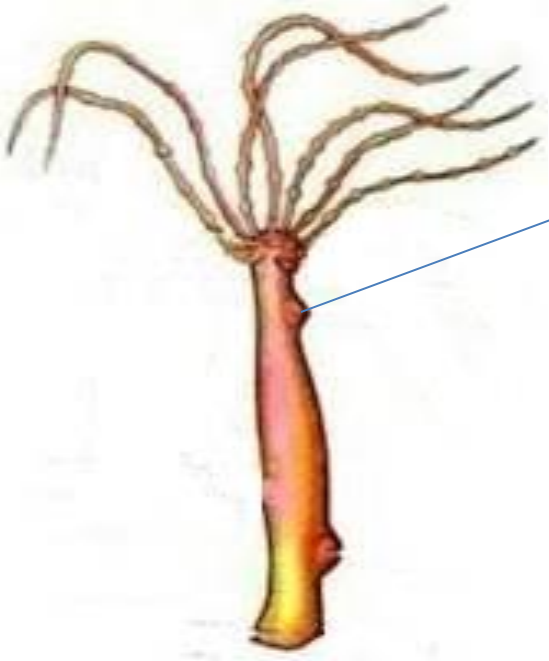

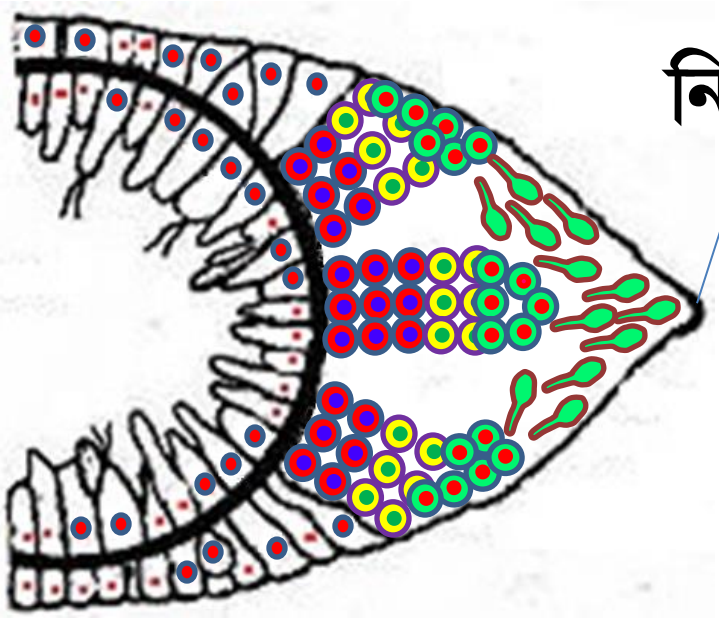

শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বার বার বিভাজিত হয়ে স্পার্মাটোগোনিয়া সৃষ্টি করে। প্রতিটি স্পার্মাটোগোনিয়াম খাদ্য গ্রহণ করে আকারে বড় হয় এবং স্পার্মাটোসাইটে পরিনত হয়। প্রতিটি স্পার্মাটোসাইট মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ৪টি করে স্পার্মাটিড উৎপন্ন করে। প্রতিটি স্পার্মাটিড স্পার্মিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণুতে রুপান্তরিত হয়। শুক্রাণুর তিনটি অংশ থাকে। মস্তক, দেহ ও লেজ

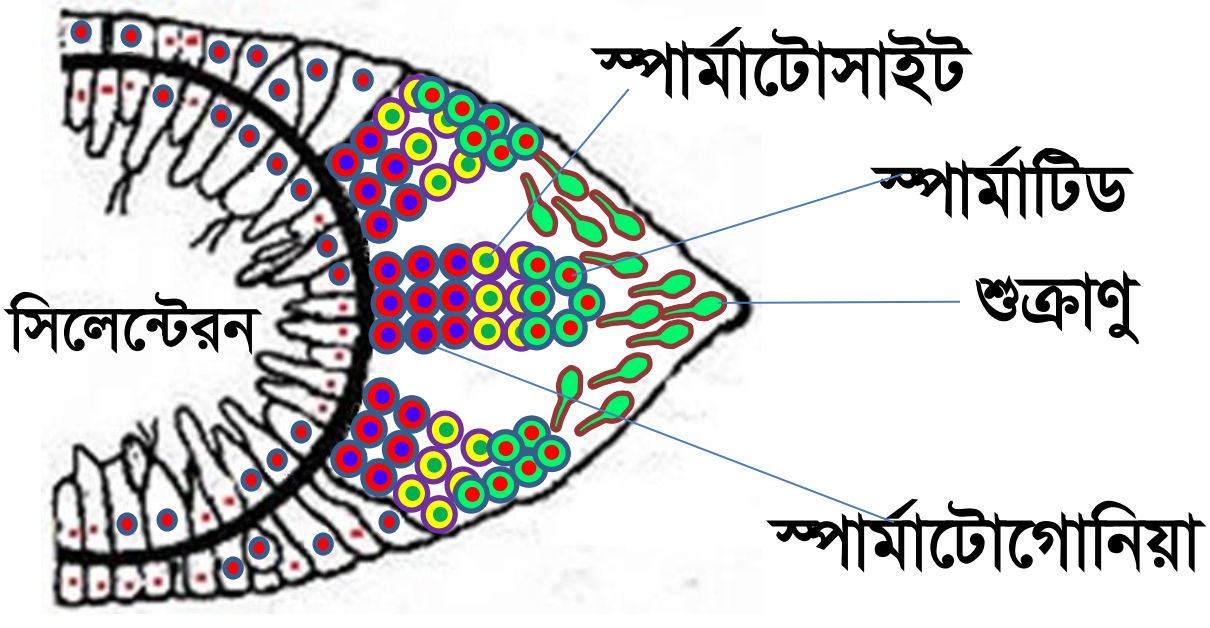

(ii) উওজেনেসিস ঃ যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় তাকে উওজেনেসিস বলে। হাইড্রার দেহের নিচের দিকে এপিডার্মাল ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভাজিত হয়ে একটি বা দুইটি ডিম্বাশয় গঠন করে। ডিম্বাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বার বার বিভাজিত হয়ে উওগোনিয়া সৃষ্টি করে।

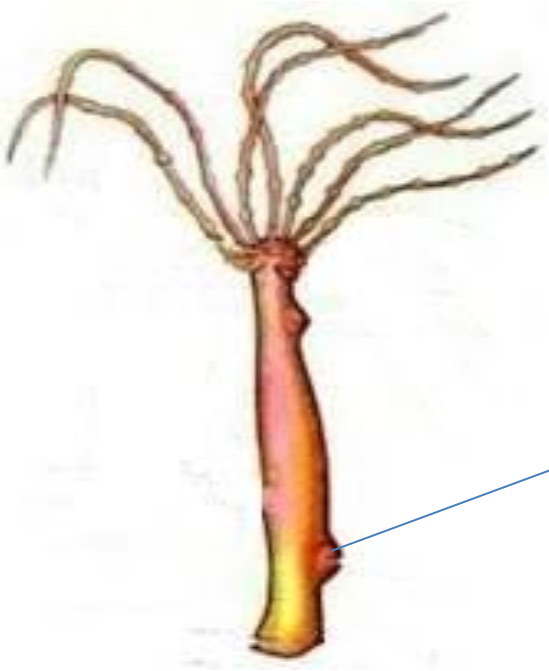

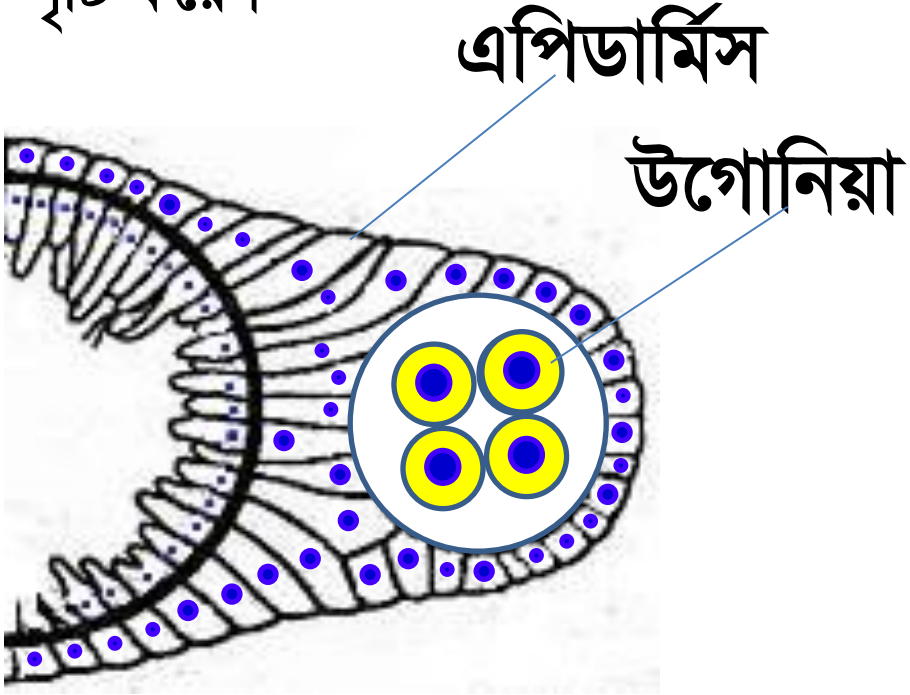

প্রতিটি উওগোনিয়াম খাদ্য গ্রহণ করে আকারে বড় হয় এবং উওসাইটে পরিনত হয়। প্রতিটি উওসাইট মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ৩টি করে ক্ষুদ্র পোলার বডি এবং একটি উওটিড উৎপন্ন করে।

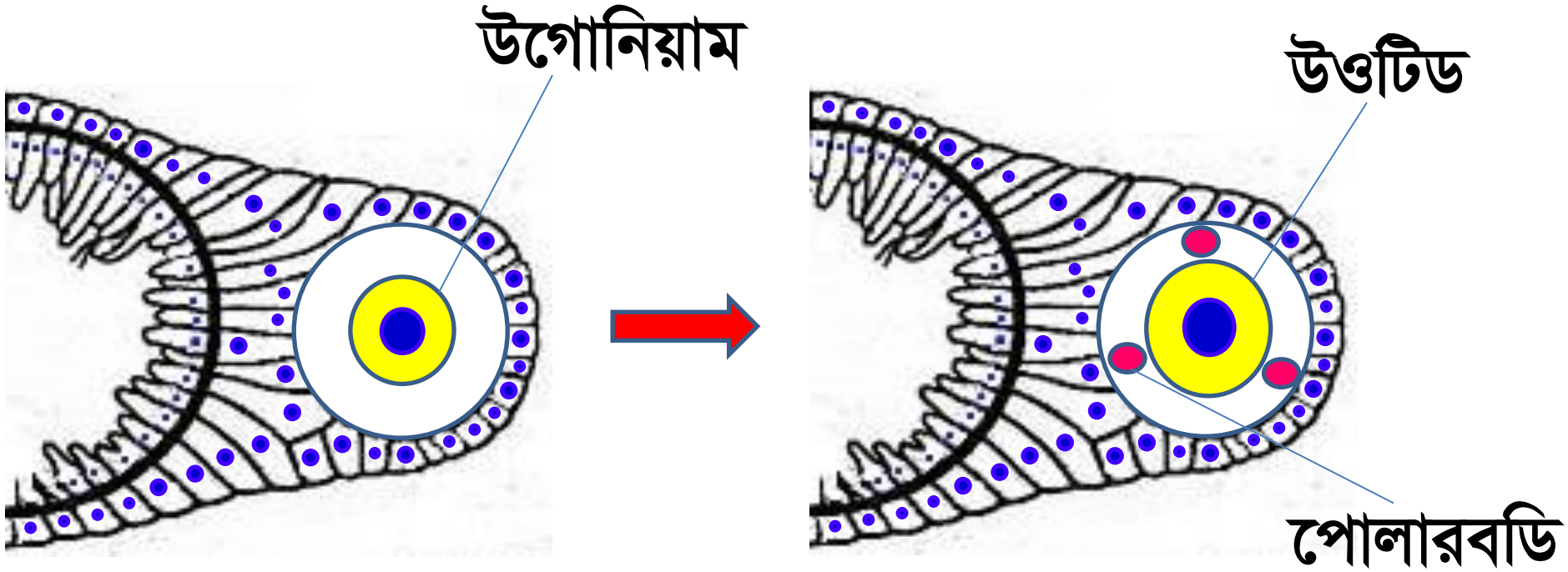

প্রতিটি উওটিডটি রুপান্তরিত হয়ে ডিম্বাণুতে পরিনত হয়। পোলারবডি তিনটি বিলুপ্তি বা নষ্ট হয়ে যায়।

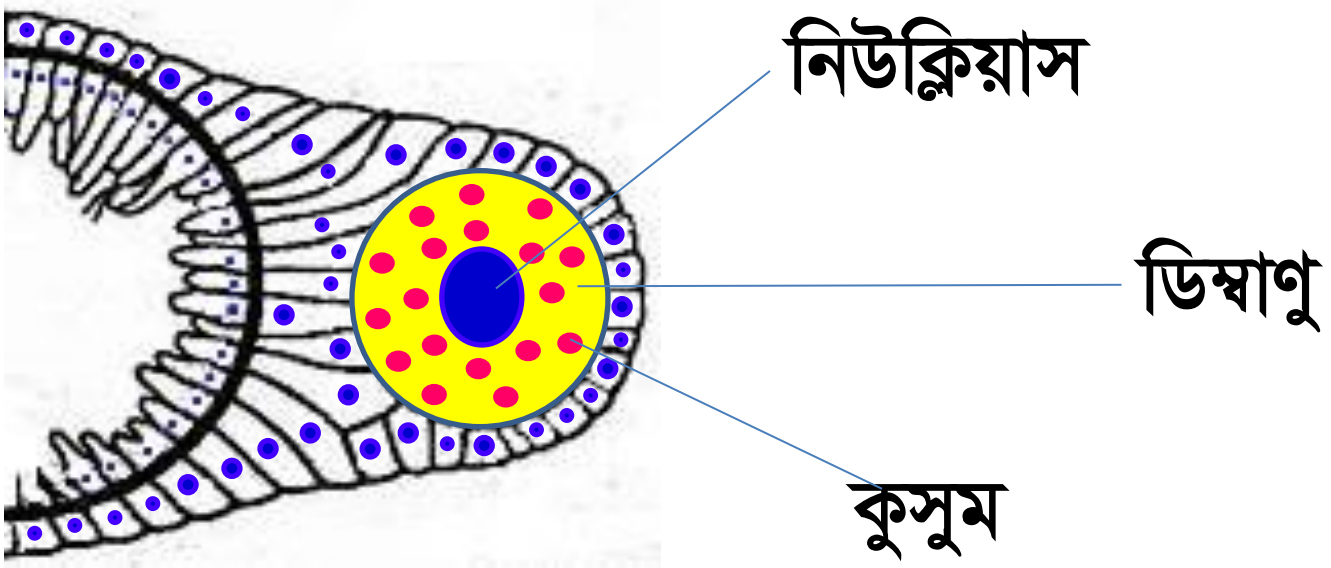

২। নিষেক ঃ শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনকে নিষেক বলে। শুক্রাণু পরিনত হয়ে শুক্রাশয়ের নিপ্‌ল বিদীর্ণ করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং পানিতে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁতার কাঁটতে থাকে। ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট সৃষ্টি করে।

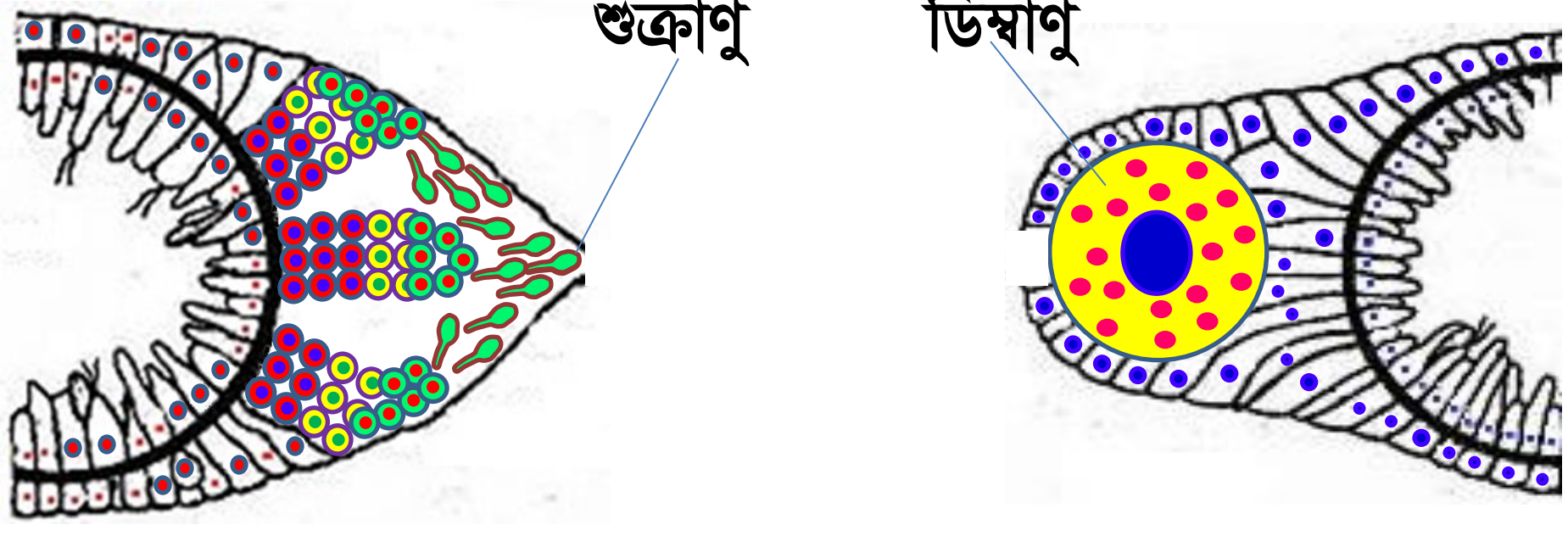

৩। পরিস্ফুটন ঃ জাইগোট বার বার বিভাজিত হয়ে পুর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিনত হওয়াকে পরিস্ফুটন বলে। হাইড্রার জাইগোটের বিভাজন হলোব্লাস্টিক বা সম্পুর্ণ ধরনের

পরিস্ফুটনের ধাপ

(i) মরুলা দশা

(ii) ব্লাস্টুলা দশা

(iii) গ্যাস্টুলা দশা

(iv) সিস্ট

(v) হাইড্রুলা

(i) মরুলা দশা ঃ জাইগোট ক্লিভেজের মাধ্যমে বার বার বিভাজিত হয়ে বহুকোষী, নিরেট ও গোলাকার কোষপিন্ডে পরিনত হয়। একে মরুলা দশা বলে। মরুলা দশায় দুই ধরনের কোষ সৃষ্টি হয়। মাইক্রোমিয়ার ও ম্যাক্রোমিয়ার।

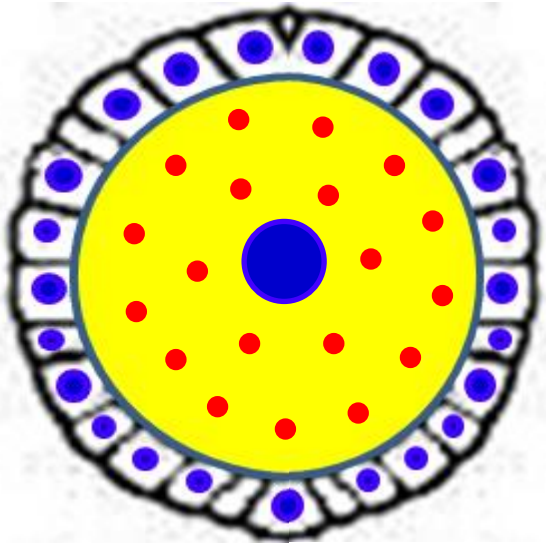

জাইগোট

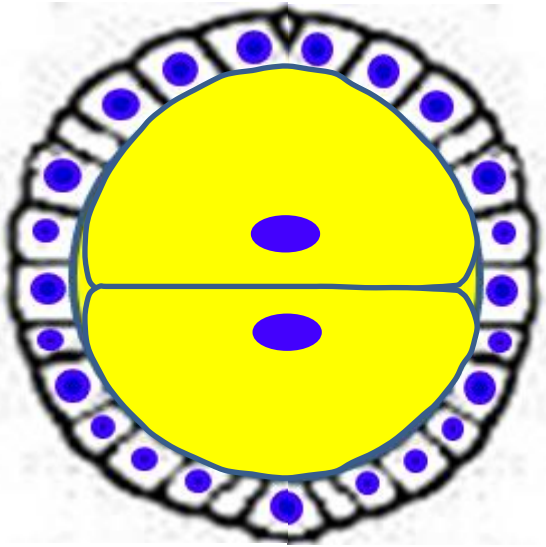

ক্লিভেজে

(ii) ব্লাস্টুলা দশা ঃ ব্লাস্টুলেশন প্রক্রিয়ায় মরুলা দশার কোষ গুলো একটি নির্দিষ্ট স্তরে সজ্জিত হয়ে ফাঁপা গোলাকার গঠন সৃষ্টি করে। একে ব্লাস্টুলা দশা বলে। ব্লাস্টুলার কেন্দ্রে যে গহ্বর থাকে তাকে ব্লাস্টোসিল বলে। ব্লাস্টুলার প্রাচীরকে ব্লাস্টোডার্ম এবং কোষ গুলোকে ব্লাস্টোমিয়ার বলে।

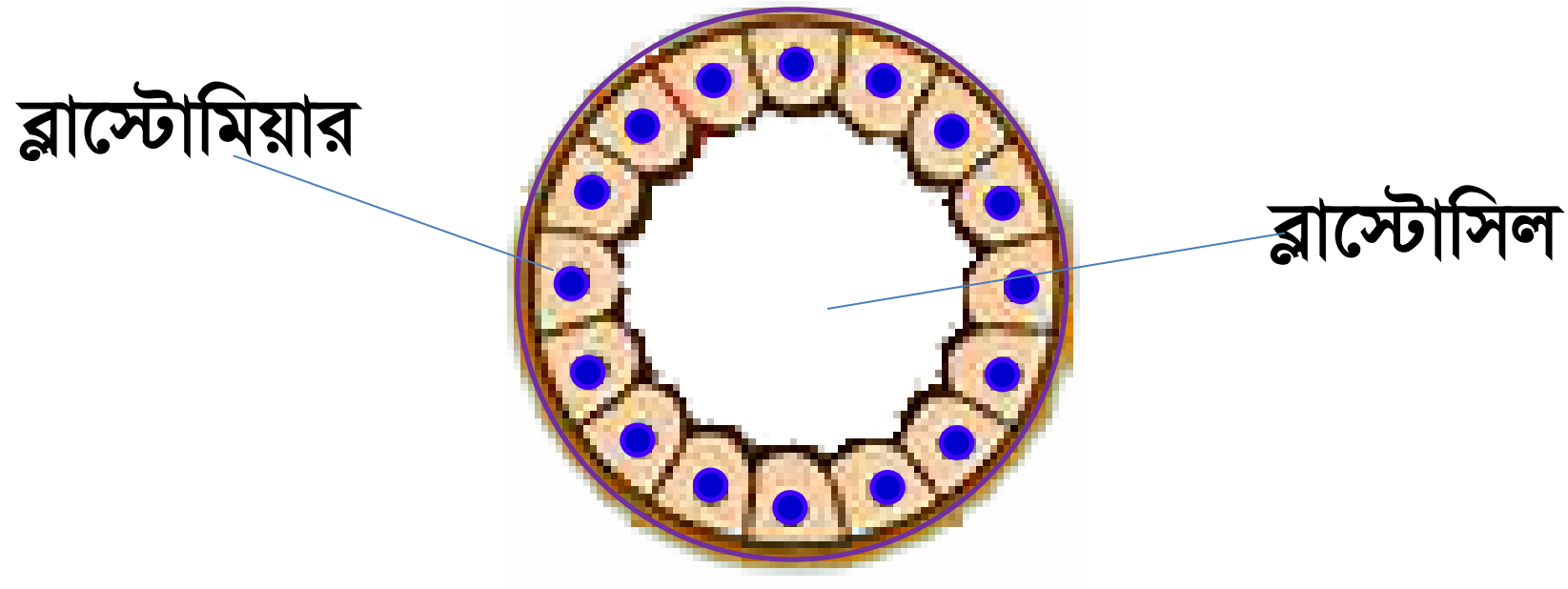

(iii) গ্যাস্টুলা দশা ঃ গ্যাস্টুলেশন প্রক্রিয়ায় ব্লাস্টোমিয়ার কোষ গুলো দুই স্তরবিশিষ্ট নিরেট ও গোলাকার গঠন সৃষ্টি করে। একে গ্যাস্টুলা দশা বলে। হাইড্রার গ্যাস্টুলা মাতৃদেহের সাথে যুক্ত থাকে বলে একে স্টেরিওগ্যাস্টুলা বলা হয়।

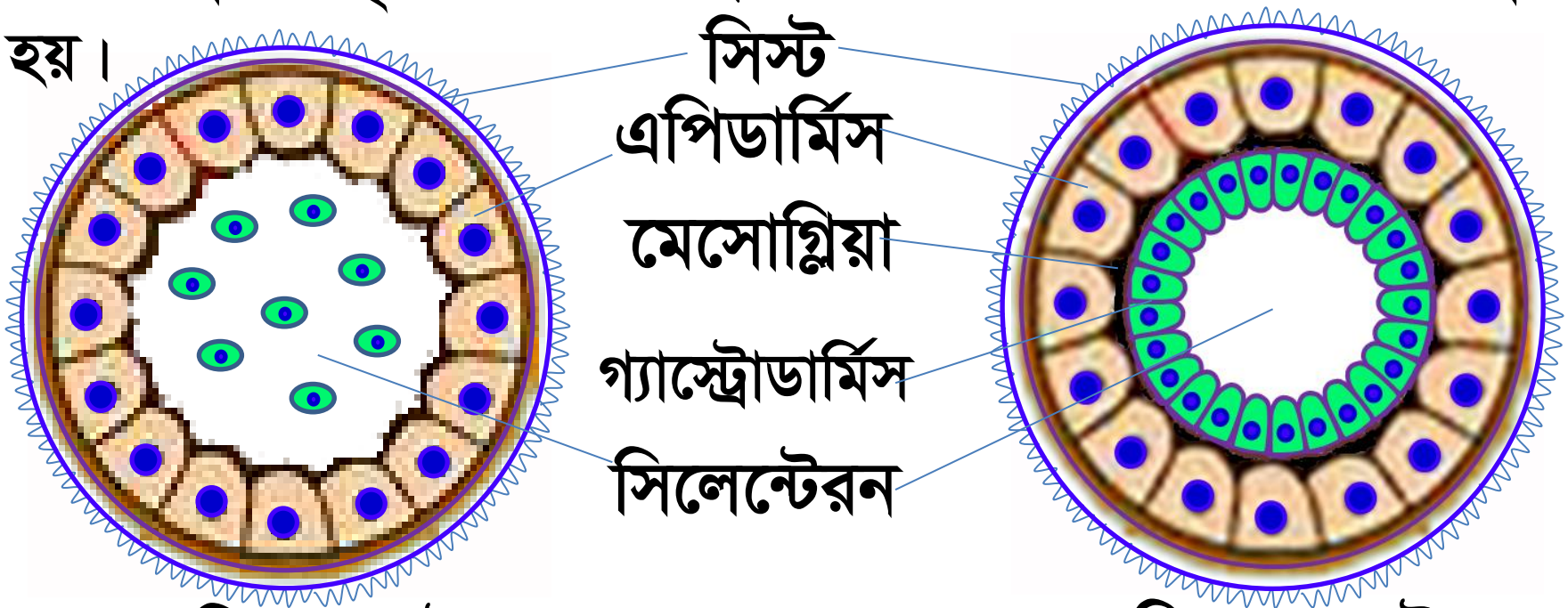

প্রাথমিক গ্যাস্টুলা

পরিনত গ্যাস্টুলা

গ্যাস্টুলার বাইরের স্তরকে এক্টোডার্ম এবং ভিতরের স্তরকে এন্ডোডার্ম বলে। এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝে জেলির মতো অকোষীয় মেসোগ্লিয়া থাকে। গ্যাস্টুলার গহ্বরকে আদি সিলেন্টেরন বলে।

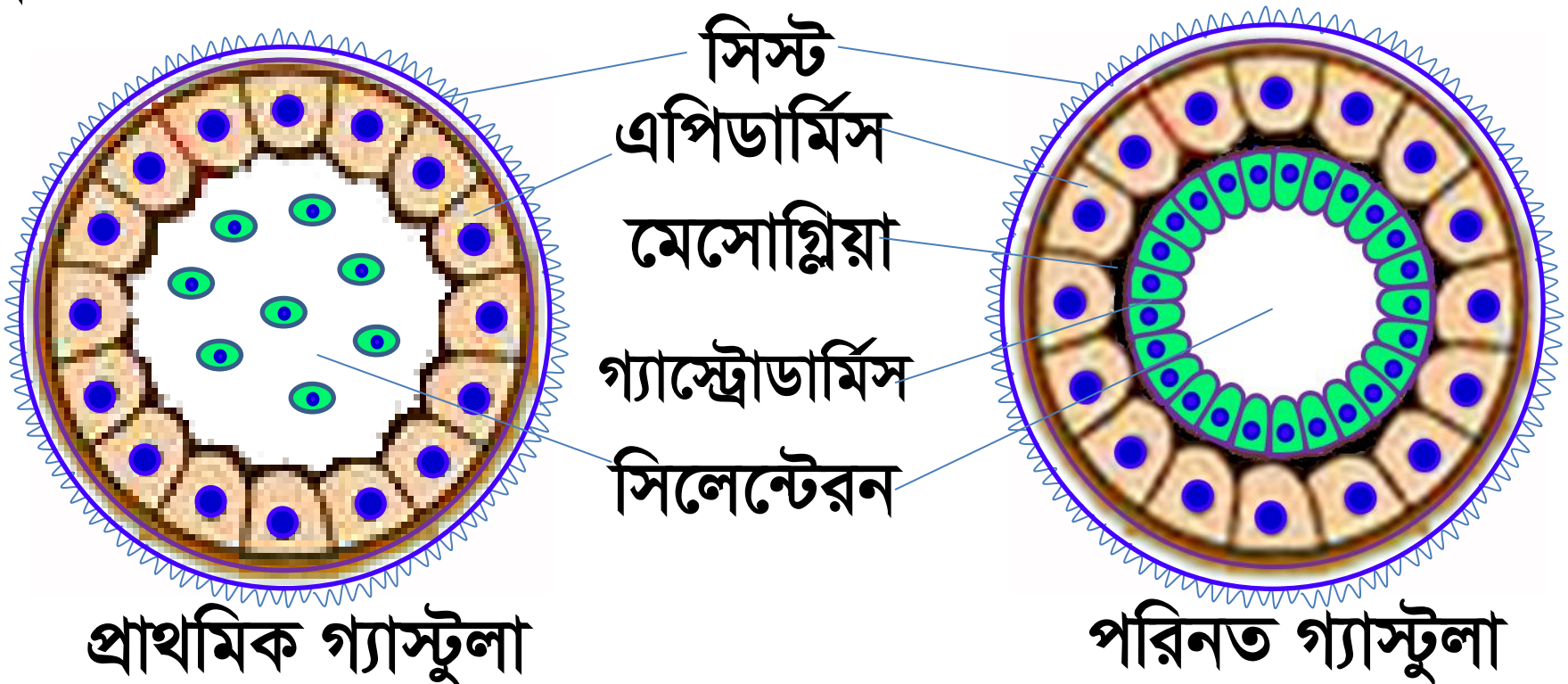

(iv) সিস্ট ঃ গ্যাস্টুলার চারিদিকে কাইটিন নির্মিত কন্টকময় আবরণী থাকে। একে সিস্ট বলে।

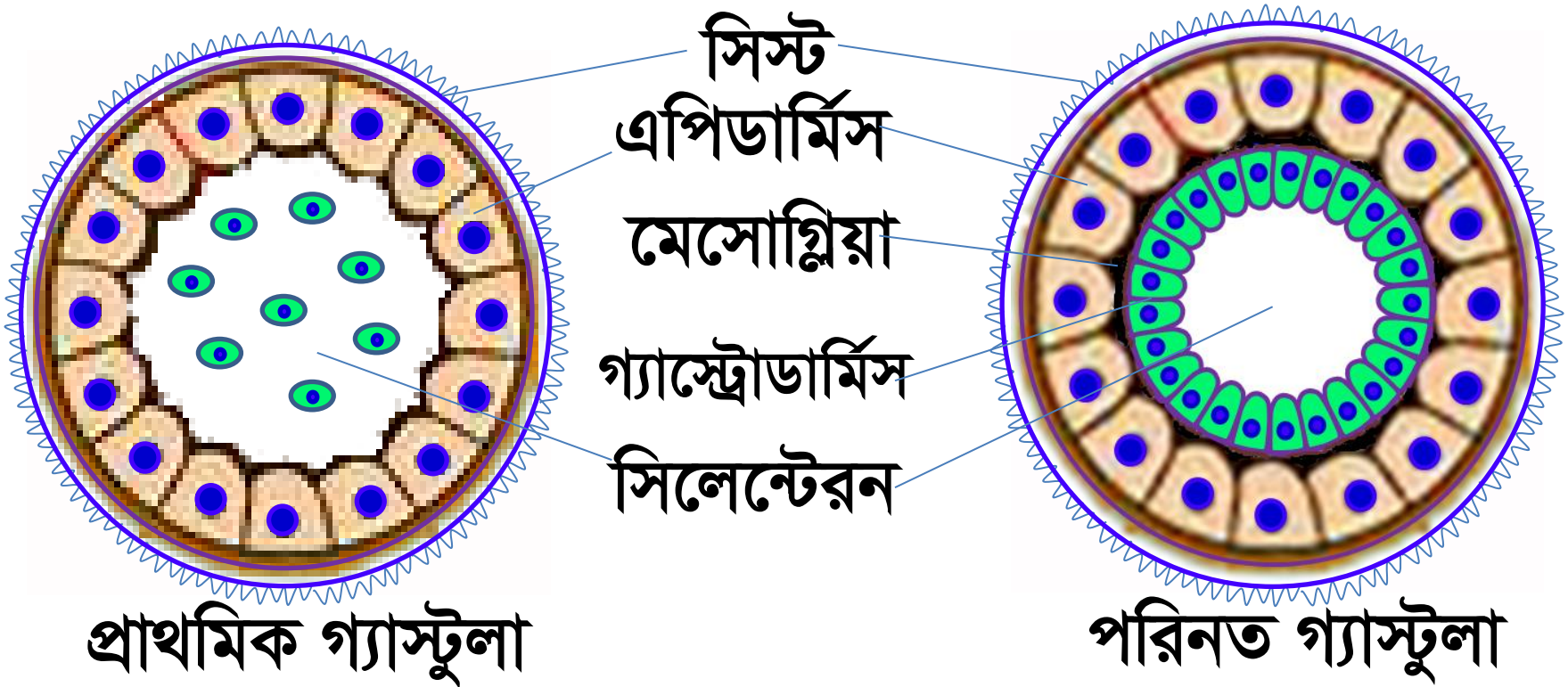

(v) হাইড্রুলা ঃ বসন্তকালে অনুকুল তাপমাত্রায় সিস্টের ভিতরে ভ্রুণ লম্বা হয়। ভ্রুণে মুখছিদ্র, হাইপোস্টোম, কর্ষিকা ও পদচাকতি গঠিত হয়। ভ্রুণের এই দশাকে হাইড্রুলা বলে।

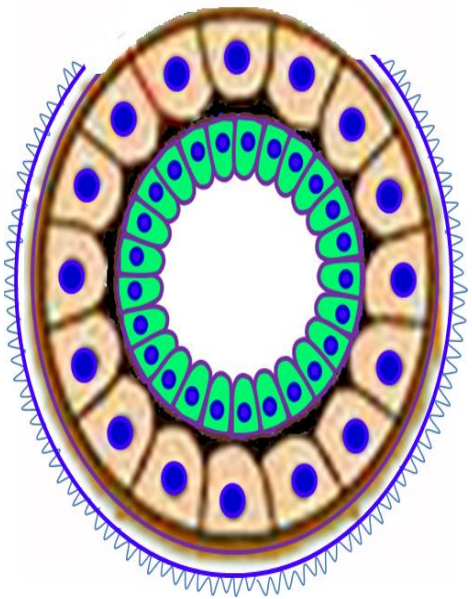

বিশ্রামরত ভ্রূণ

শিশু হাইড্রা

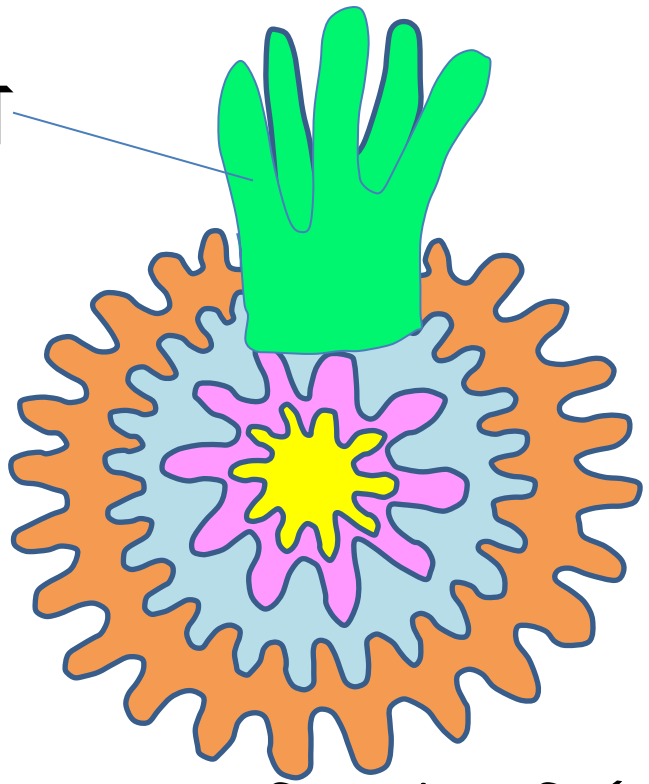

সিস্ট ভেদ করে শিশু হাইড্রা নির্গমণ

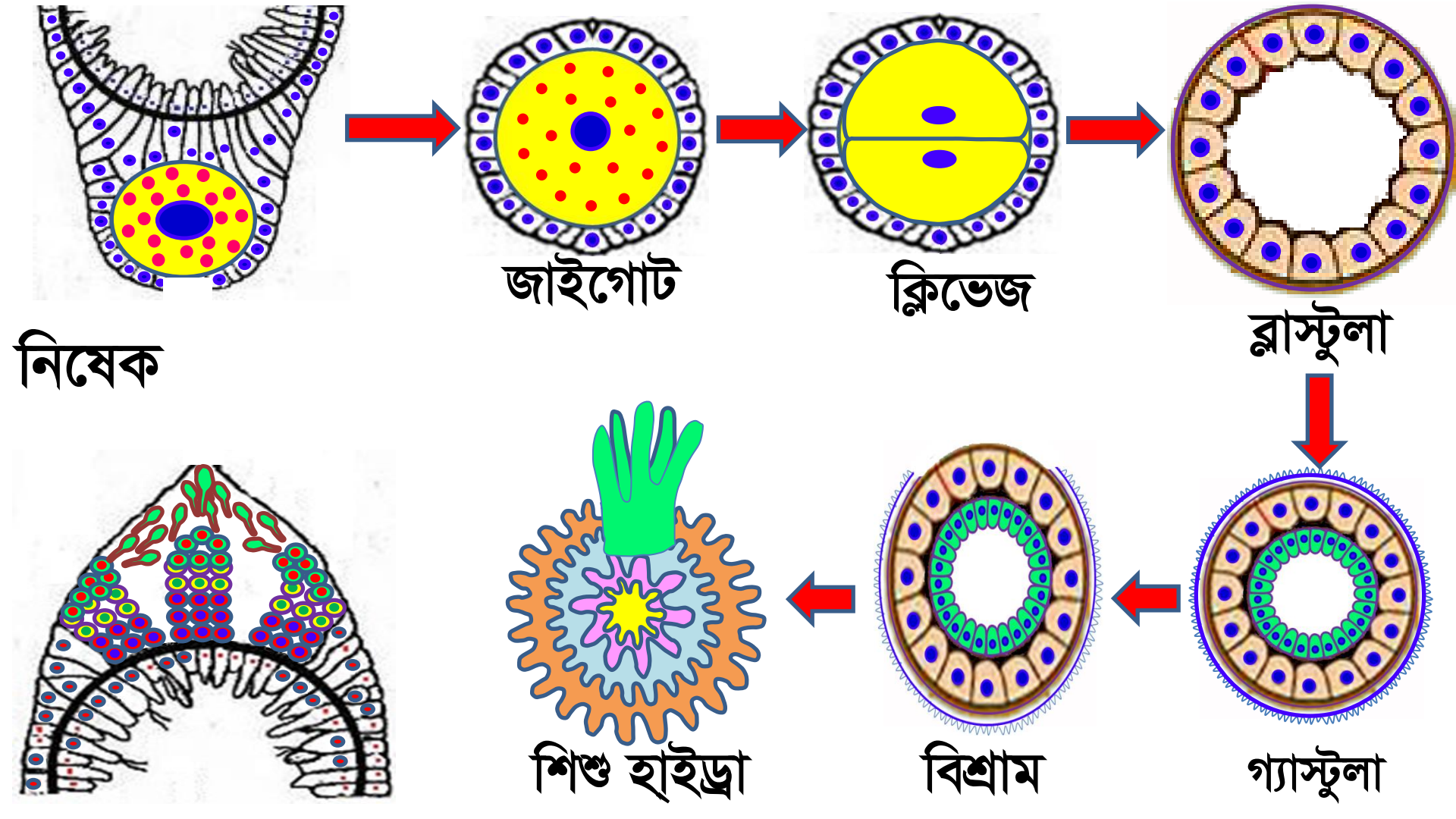
নিষেক
জাইগোট
ক্লিভেজ
ব্লাস্টুলা
গ্যাস্টুলা
বিশ্রাম
শিশু হাইড্রা

হাইড্রা উভলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও স্বনিষেক ঘটে না কেন

অধিকাংশ হাইড্রা একলিঙ্গবিশিষ্ট **(dioecious)**, তবে কিছু সংখ্যক হাইড্রা উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট **(monoecious)** প্রাণী। স্বনিষেক একটি যৌনজনন প্রক্রিয়া। একই প্রাণীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনকে স্বনিষেক বলে। হাইড্রা উভলিঙ্গ প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও স্বনিষেক ঘটে না। উভলিঙ্গ হাইড্রায় শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় উভয় বিদ্যমান। দেহের উপরের দিকে শুক্রাশয় এবং দেহের নিচের দিকে ডিম্বাশয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু হাইড্রায় শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে।

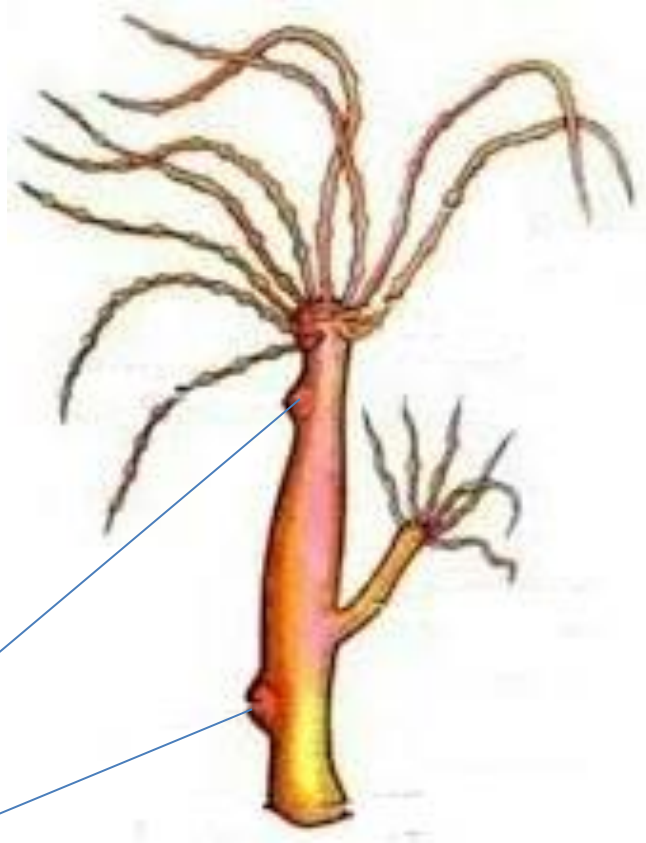

যে ঋতুতে শুক্রাশয় সৃষ্টি হয় সে ঋতুতে ডিম্বাশয় সৃষ্টি হয় না। যখন শুক্রাণু পরিপক্ক হয় তখন ডিম্বাণু অপরিপক্ক থাকে। আবার, ডিম্বাণু যখন পরিপক্ক হয় শুক্রাণু তখন অপরিপক্ক থাকে। অর্থাৎ ডিম্বাণু যখন নিষিক্ত হওয়ার উপযুক্ত তখন শুক্রাণু অপরিনত থাকে। তাই একই হাইড্রার শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কখনো মিলিত হতে পারে না। এ কারণে হাইড্রায় স্বনিষেক ঘটে না।

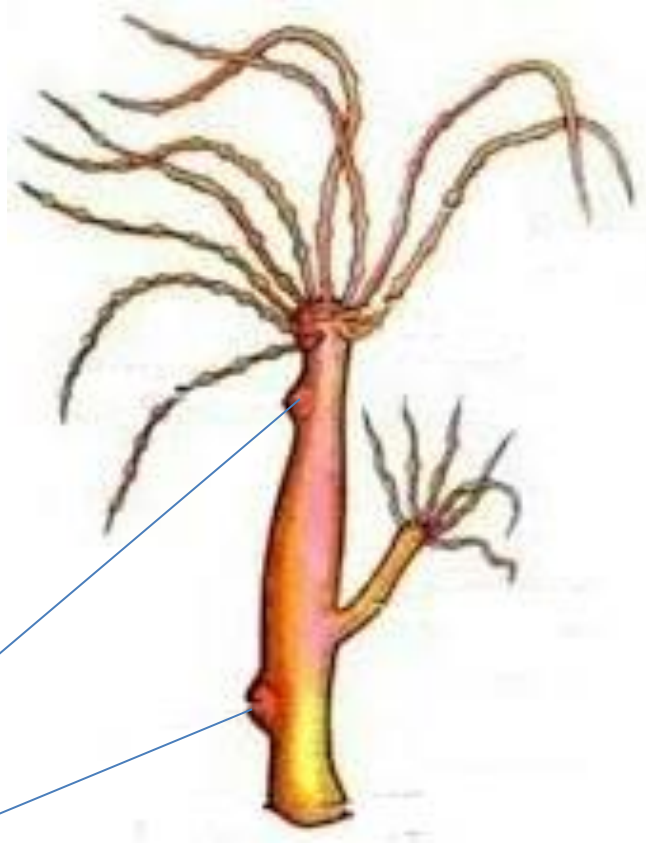

হাইড্রার মুকুলোদ্‌গম প্রক্রিয়া

হাইড্রার মুকুলোদ্‌গম একটি অযৌন জনন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধির জন্য পুরুষ বা স্ত্রী হাইড্রার প্রয়োজন হয় না। তাই ইহা একটি সহজ পদ্ধতি। গ্রীষ্মকালে পরিবেশে খাদ্যের পরিমাণ বেশি থাকে। হাইড্রা খাদ্য গ্রহণ করে দৈহিক ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন হাইড্রায় মুকুলোদ্‌গম ঘটে। মুকুলের সংখ্যা যত বেশি হবে হাইড্রার সংখ্যা বৃদ্ধি তত দ্রুত হবে।

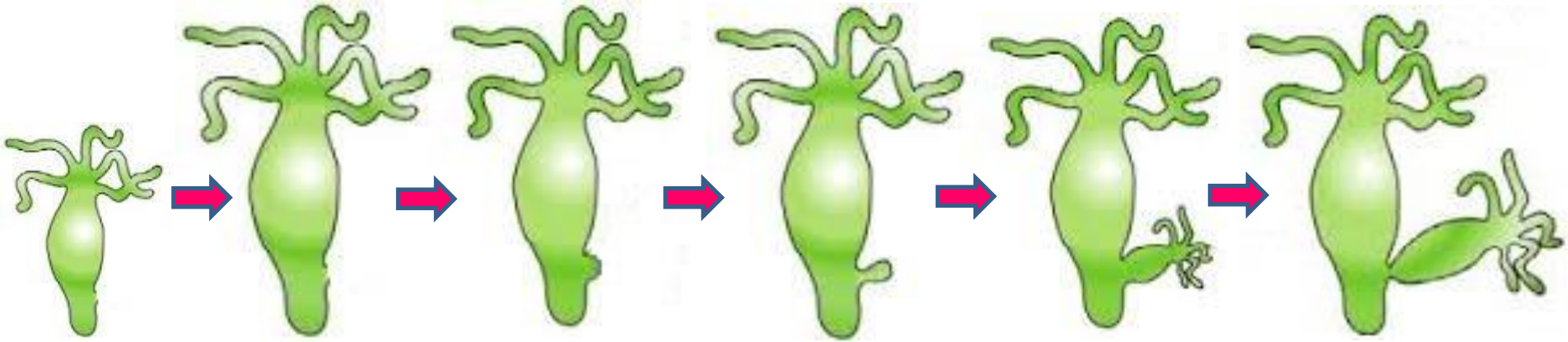

১। গ্রীষ্মকালে হাইড্রা পরিবেশ হতে খাদ্য গ্রহণ করে বৃদ্ধি লাভ করে এবং আকারে বড় হয়।

২। দেহের মধ্যাংশ অথবা নিম্নাংশের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভাজিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র স্ফীত অংশের সৃষ্টি করে।

৩। স্ফীত অংশটি বৃদ্ধি পেয়ে ফাঁপা ও নলাকার মুকুলে পরিনত হয়।

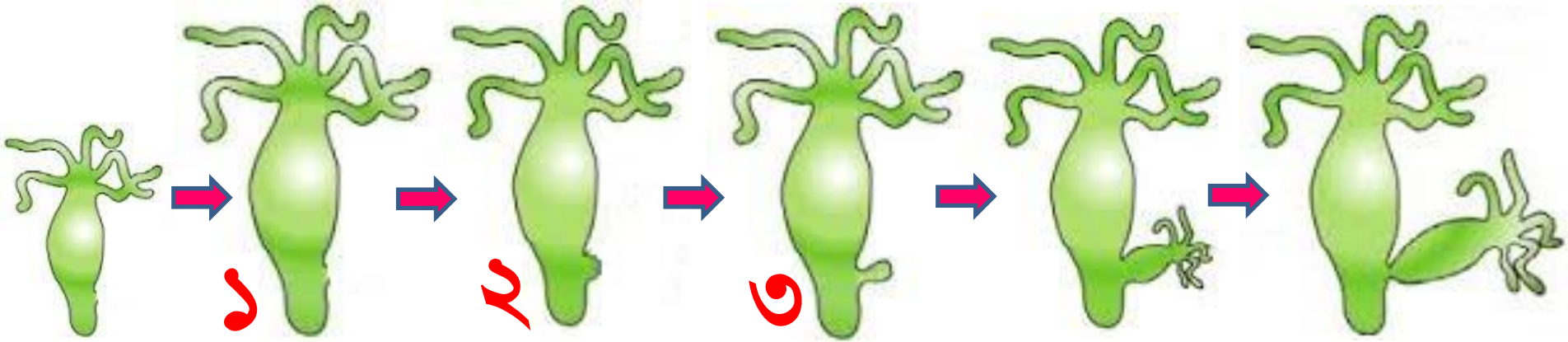

৪। মুকুলে ধীরে ধীরে এপিডার্মিস, মেসোগ্লিয়া ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস উৎপন্ন হয়।

৫। সিলেন্টেরন ধীরে ধীরে মাতৃহাইড্রা হতে মুকুলে প্রসারিত হয়।

৬। মুকুলটি মাতৃহাইড্রা হতে পুষ্টি গ্রহণ করে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৭। মুকুলে মুখছিদ্র, হাইপোস্টোম ও কর্ষিকা গঠিত হয়।

৮। মাতৃহাইড্রা ও মুকুলের সংযোগস্থলে একটি বৃত্তাকার খাঁজ সৃষ্টি হয়।

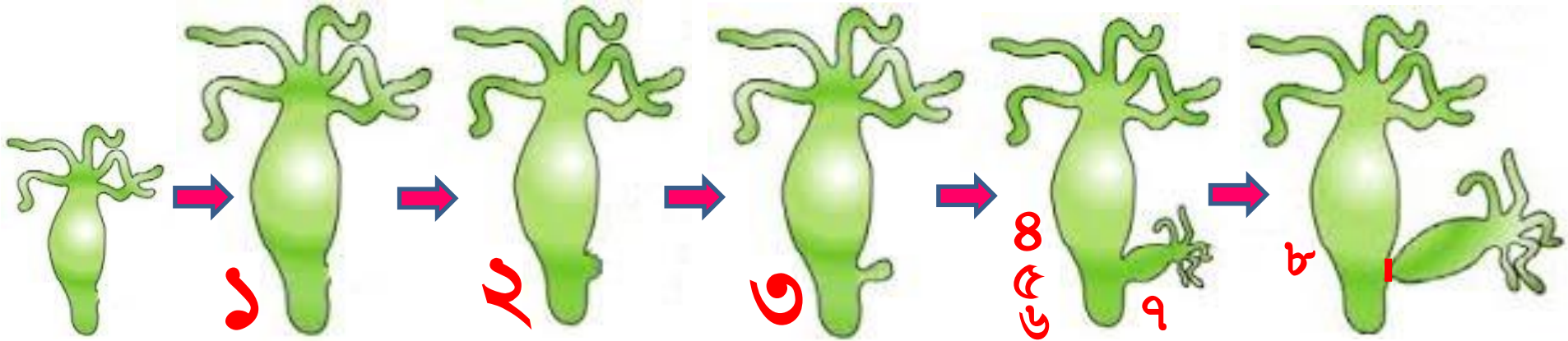

৯। খাঁজটি ধীরে ধীরে গভীর হয়ে অপত্য হাইড্রাকে মাতৃহাইড্রা হতে বিচ্ছিন্ন করে।

১০। অপত্য হাইড্রা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পদতল গঠিত হয়। এরপর উহা নিমজ্জিত বস্তুর সাথে আটকে থাকে এবং স্বাধীন ভাবে জীবন-যাপন করে।

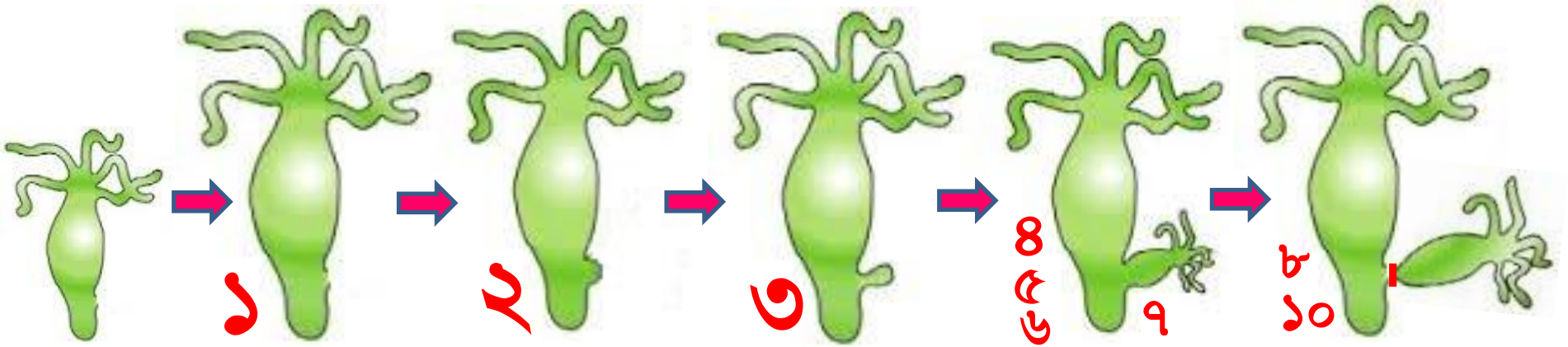

একটি হাইড্রায় একই সঙ্গে কয়েকটি মুকুল সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিটি মুকুল থেকে আবার নতুন মুকুল সৃষ্টি হতে পারে। এ সময় মাতৃহাইড্রাকে দলবদ্ধ প্রাণীর মতো মনে হয়। মুকুল সৃষ্টি এবং মাতৃ হাইড্রা হতে বিচ্যুত হয়ে স্বাধীন ভাবে জীবন-যাপন করতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

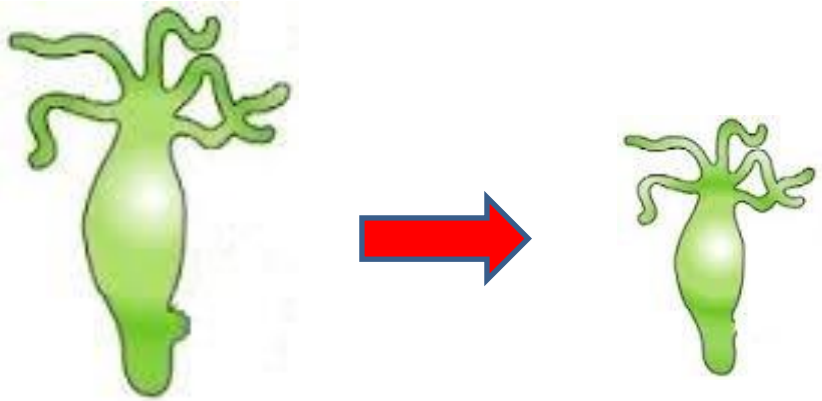

হাইড্রার পুনরুৎপত্তি

Regeneration

যে প্রক্রিয়ায় কোন প্রাণীর হারানো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া দেহাংশ পুনর্গঠন হয় তাকে পুনরুৎপত্তি বলে।

হাইড্রার টটিপটেন্সি ক্ষমতা থাকায় ব্যাপক পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা রয়েছে। সুইস বিজ্ঞানী আব্রাহাম ট্রেম্বলে সর্বপ্রথম হাইড্রার পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেন।

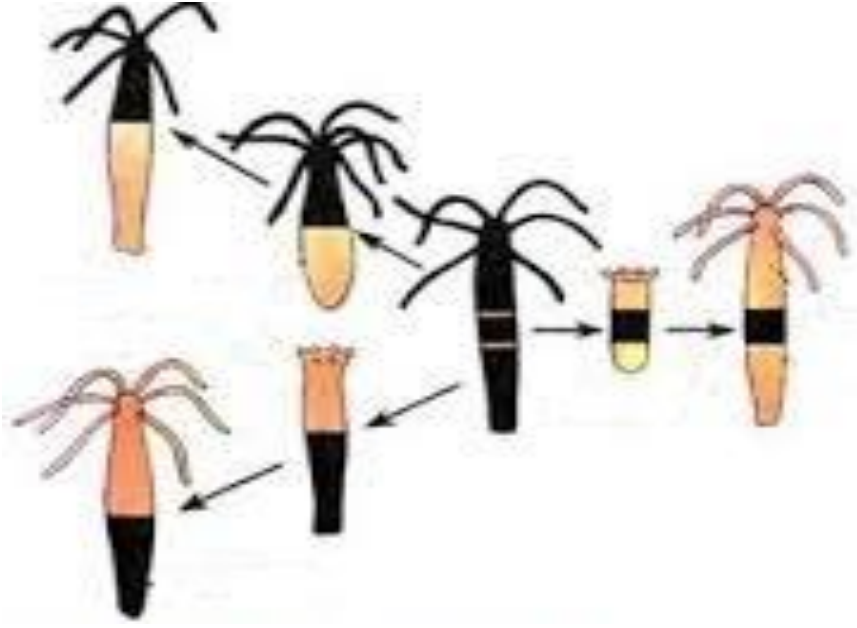

১। হাইড্রাকে অনুপ্রস্থ ভাবে কয়েক খন্ড করা হলে প্রতিটি খন্ড থেকে একটি করে পুর্ণাঙ্গ হাইড্রা সৃষ্টি হয়। প্রতিটি খন্ডই মেরুতা বজায় রাখে। অর্থাৎ মৌখিক প্রান্ত থেকে কর্ষিকা ও হাইপোস্টোম এবং বিমৌখিক প্রান্ত থেকে পাদ-চাকতি গঠিত হয়।

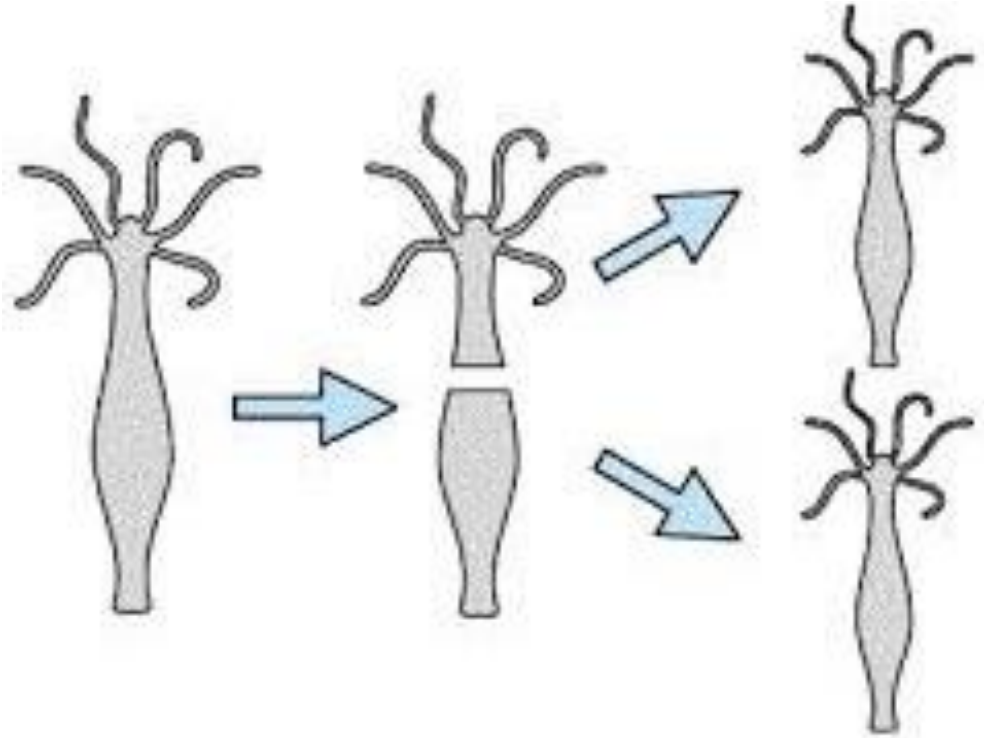

২। হাইড্রা দেহকে লম্বালম্বি ভাবে দুই ভাগে ভাগ করলে প্রতিটি ভাগ থেকে একটি করে পুর্ণাঙ্গ হাইড্রা সৃষ্টি হয়।

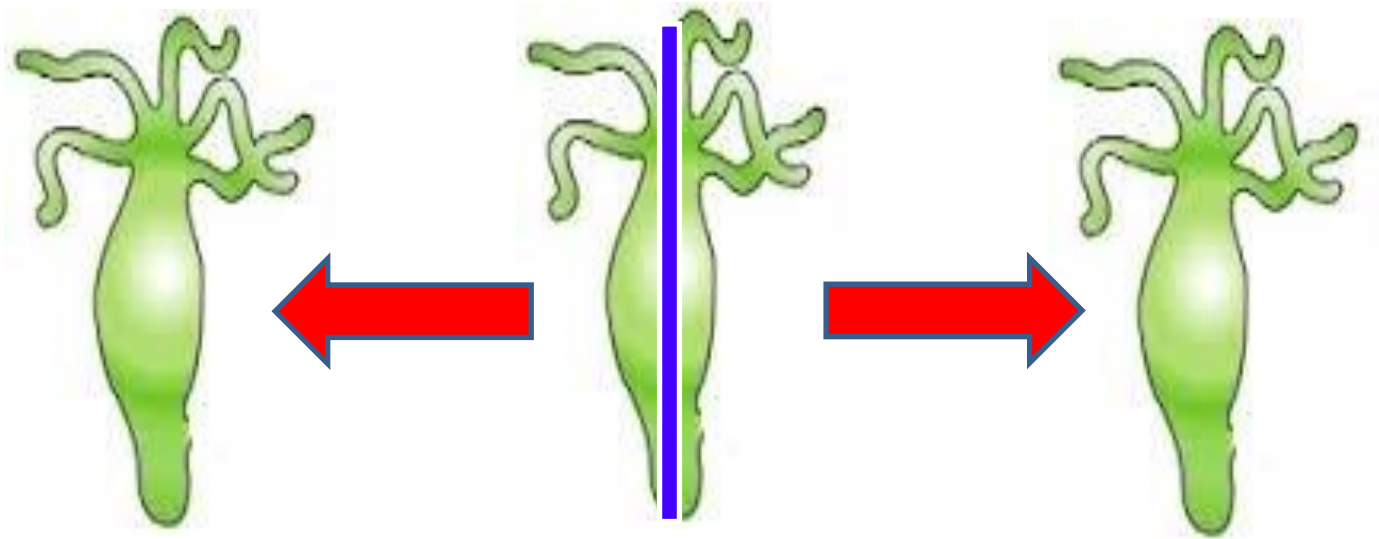

৩। হাইড্রার মাথা লম্বালম্বি ভাবে দুই ভাগে ভাগ করলে প্রতিটি ভাগ থেকে একটি করে মাথা সৃষ্টি হয়।

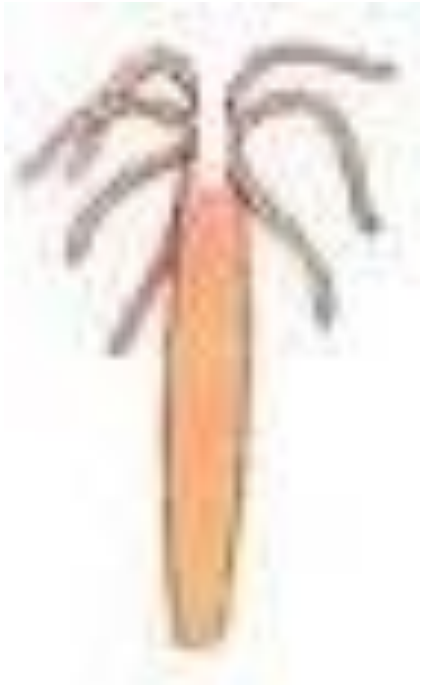

গ্রিক পুরানে রুপকথার দানব হাইড্রা এর নামানুসারে এই প্রাণীটির নামকরণ করা হয়েছে হাইড্রা। এই দানবের নয়টি মাথা ছিল। শক্তিধর মানব হারকিউলিস এ দানবের মাথা কেটে ফেললে ঐ স্থানে দু'টি মাথা গজাতো।

হাইড্রার
শ্বসন-রেচন
অসমোরেগ্যুলেশন

হাইড্রা নিম্নশ্রেণীর প্রাণী। এদের কোন শ্বসন ও রেচন অঙ্গ নাই। দেহপ্রাচীরের এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের কোষ গ্যাসীয় বিনিময়ে অংশ গ্রহণ করে। এই কোষগুলো ব্যাপন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় গ্যাসীয় পদার্থের বিনিময় ঘটায়। ধারণা করা হয়, সিলেন্টেরনের পানিতে কিছু গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। এদের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ হলো ইউরিয়া। ইউরিয়া গ্যাসীয় বিনিময়ের মাধ্যমে বহিস্কৃত হয়। মনে করা হয়, পদচাকতির কিছু কোষ রেচন পদার্থ জমা করে এবং একটি অস্থায়ী ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে নিক্ষেপ করে। হাইড্রায় অসমোরেগুলেটরী অঙ্গ নাই। তাই অসমোরেগুলেশন ঘটে না। দেহে পানি ও আয়নের সমতা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা আজও অজানা ।

হাইড্রার স্নায়ুতন্ত্র

হাইড্রা নিম্নশ্রেণীর প্রাণী। এদের দেহে দুর্বল প্রকৃতির স্নায়ুতন্ত্র বিদ্যমাণ। প্রাণীজগতে হাইড্রা তথা নিডারিয়ানদের সর্বপ্রথম স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে। এদের অনিয়তাকার স্নায়ুকোষ থেকে স্নায়ুতন্ত্র বের হয় এবং মিলিত হয়ে স্নায়ুজালক গঠন করে। স্নায়ুতন্ত্র গুলোতে অ্যাক্সন বা ডেনড্রাইট থাকে না এবং কখনো সিন্যাপস্ গঠন করে না।

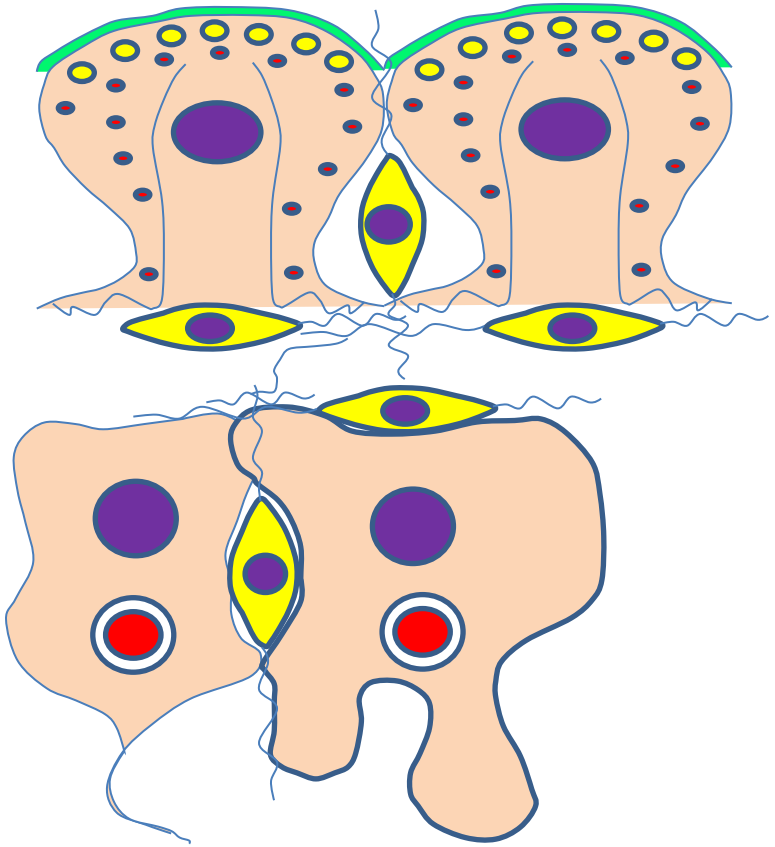

মেসোগ্লিয়ার উভয় পাশে একটি করে স্নায়ুজালক থাকে। স্নায়ুজালক গুলো এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের সাথে যুক্ত থাকে। মুখছিদ্র ও পদচাকতিতে স্নায়ুজালক গুলো ঘনসন্নিবিষ্টভাবে অবস্থান করে। স্নায়ুজালক গুলো একে অপরের সাথে এবং সংবেদী কোষ ও পেশি কোষের সাথে যুক্ত থাকে। সংবেদী কোষ পরিবেশ হতে আলোক, স্পর্শ ও রাসায়নিক উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এরপর স্নায়ুজালকের মাধ্যমে পেশি আবরণী কোষে প্রেরণ করে।

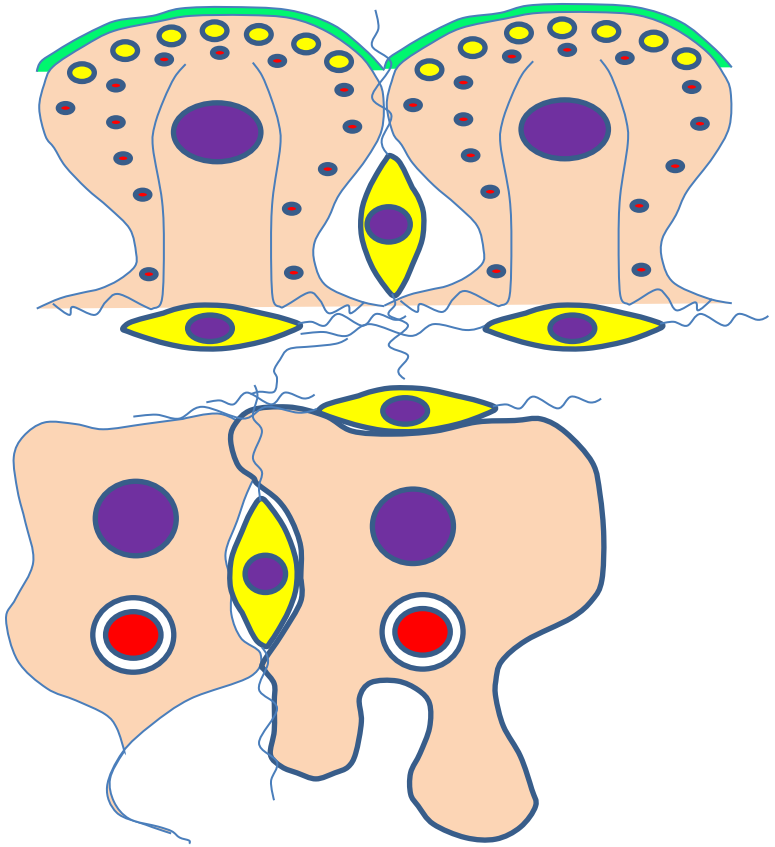

হাইড্রার বিভিন্ন ধরনের চলন

যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহ জৈবিক প্রয়োজনে নিজ প্রচেষ্টায় স্থানান্তরিত হয় তাকে চলন বলে।

১। লুপিং
২। সমারসল্টিং
৩। গ্লাইডিং
৪। ভাসা চলন
৫। সাঁতার
৬। হামাগুড়ি চলন
৭। হাঁটা চলন
৮। দেহের সংকোচন-প্রসারণ

১। লুপিং বা ফাঁসা বা জোঁকা বা শুঁয়াপোকা চলন **(Looping)**

যে প্রক্রিয়ায় হাইড্রা লুপ বা ফাঁস সৃষ্টির মাধ্যমে চলাচল করে তাকে লুপিং চলন বলে। হাইড্রা লম্বা দুরত্ব অতিক্রমের জন্য লুপিং চলন প্রদর্শন করে।

(i) এ প্রক্রিয়ায় হাইড্রা পদতল দ্বারা গতিপথের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

(ii) মাথাকে সামনের দিকে বাঁকিয়ে কর্ষিকা দ্বারা গতিপথকে স্পর্শ করে।

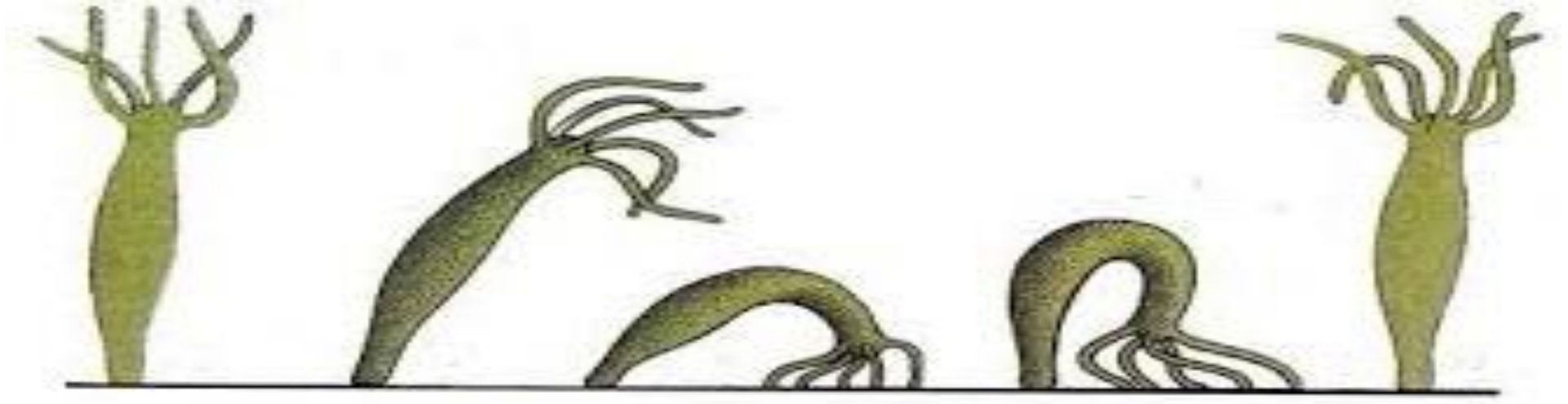

(iii) কর্ষিকার নেমাটোসিস্ট দ্বারা ভিত্তিকে স্পর্শ করলে পদতল ও মাথার মাঝখানে একটি লুপ সৃষ্টি হয়।

(iv) এরপর পদতলকে টেনে মাথার কর্ষিকার নিকটে আনে।

(v) পদতল দ্বারা গতিপথকে পুনরায় স্পর্শ করে।

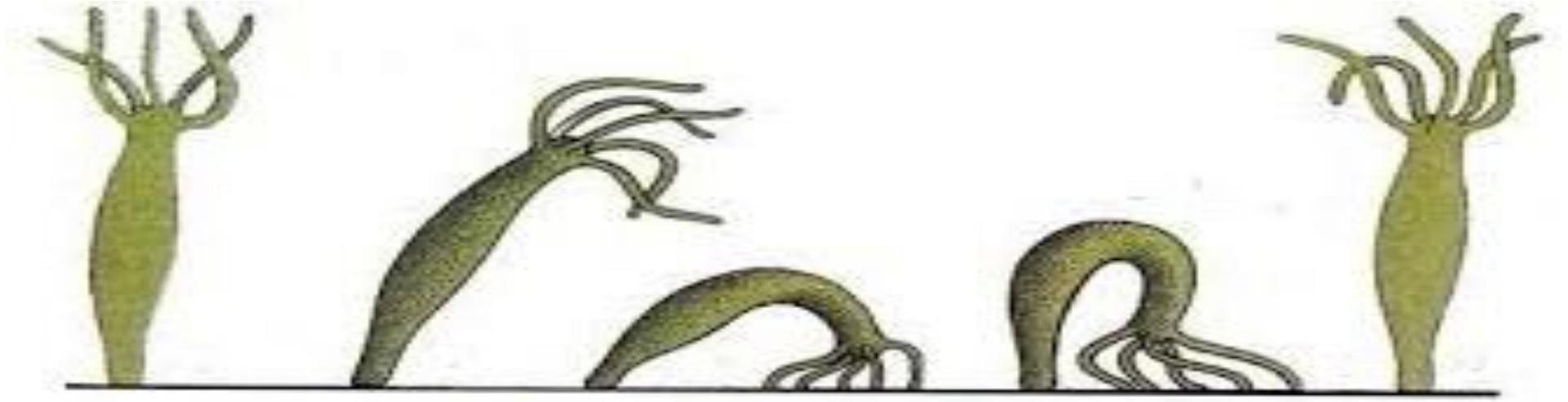

(vi) পদতলের উপর ভর করে মাথা উচিয়ে পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

(vii) অতঃপর মাথাকে সামনের দিকে বাঁকিয়ে অগ্রসর হয়।

এভাবে লুপ তৈরীর মাধ্যমে হাইড্রা সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

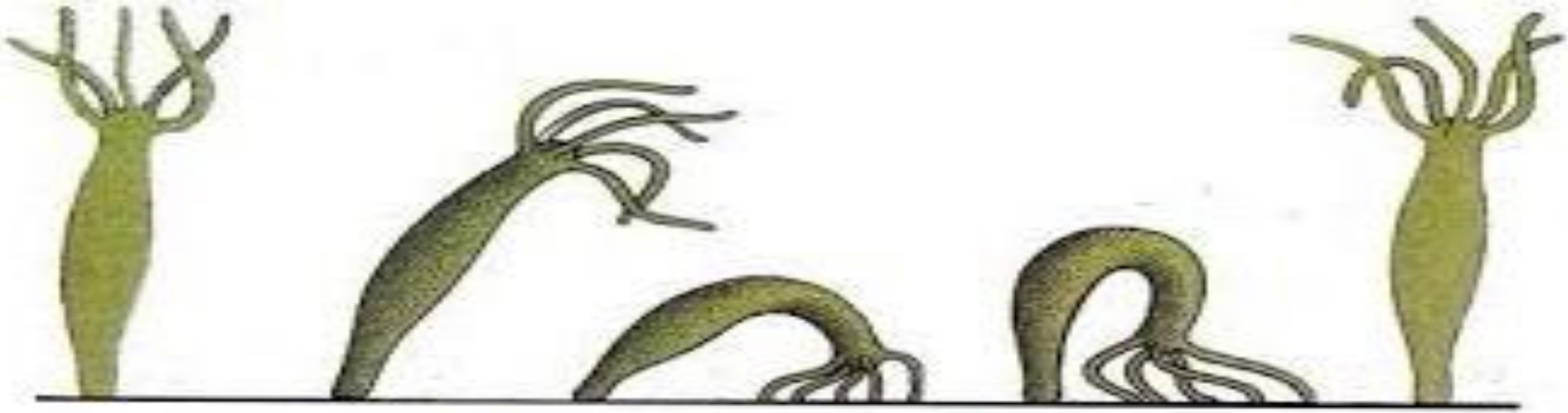

২। সমারসল্টিং বা ডিগবাজী (Somersaulting)

হাইড্রার দ্রুত চলন প্রক্রিয়া হলো সমারসল্টিং। প্রতিবার চলনে দুইটি লুপ সৃষ্টি হয়।

(i) এ প্রক্রিয়ায় হাইড্রা পদতল দ্বারা গতিপথকে স্পর্শ করে।

(ii) পদতলের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

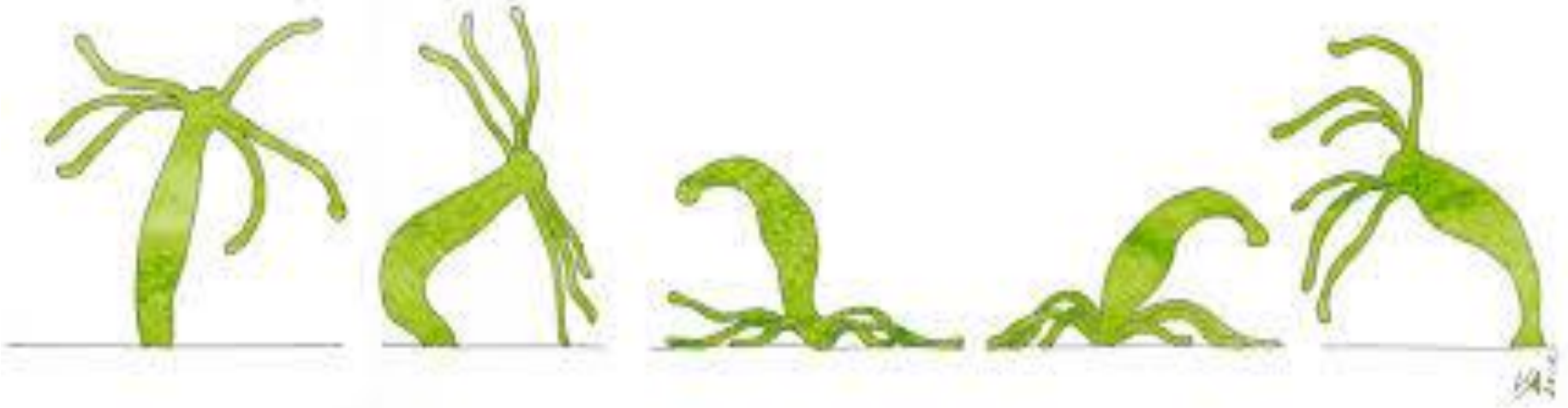

(iii) মাথাকে সামনের দিকে বাকিয়ে কর্ষিকা দ্বারা গতিপথকে স্পর্শ করে।

(iv) কর্ষিকার উপর ভর করে পদতল উপরে উঠিয়ে উল্টো ভাবে দাঁড়ায়।

(v) পদতলের উপর ভর করে কর্ষিকা মুক্ত করে এবং মাথা উপরে উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবে ডিগবাজীর মাধ্যমে হাইড্রা সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

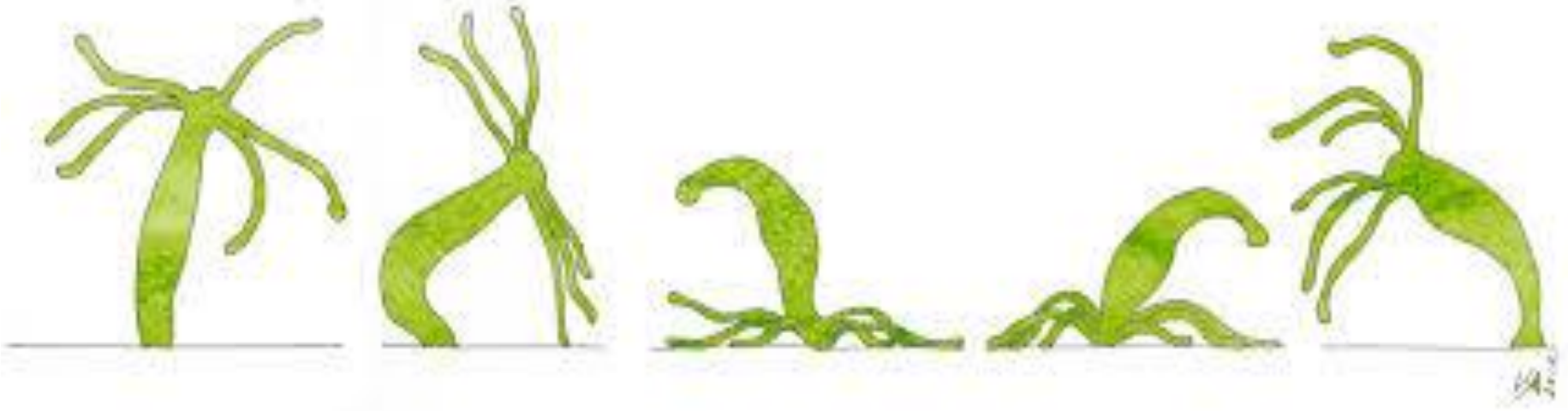

৩। গ্লাইডিং বা অ্যামিবয়েড চলন **(Gliding)**

অতি সামান্য দুরত্ব অতিক্রমের জন্য হাইড্রা গ্লাইডিং প্রক্রিয়ায় চলাচল করে। এ প্রক্রিয়ায় হাইড্রা অ্যামিবার মতো ধীরগতিতে চলে। হাইড্রার পদতলের কোষ হতে পিচ্ছিল রস নিঃসৃত হয়। পদতলের ঐ স্থান হতে ক্ষণপদ সৃষ্টি হয়। ক্ষণপদ মসৃণ তলে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। সেই সঙ্গে হাইড্রাও অতি ধীরগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এভাবে হাইড্রা অতি ধীরে ধীরে অতি সামান্য দুরত্ব অতিক্রম করে।

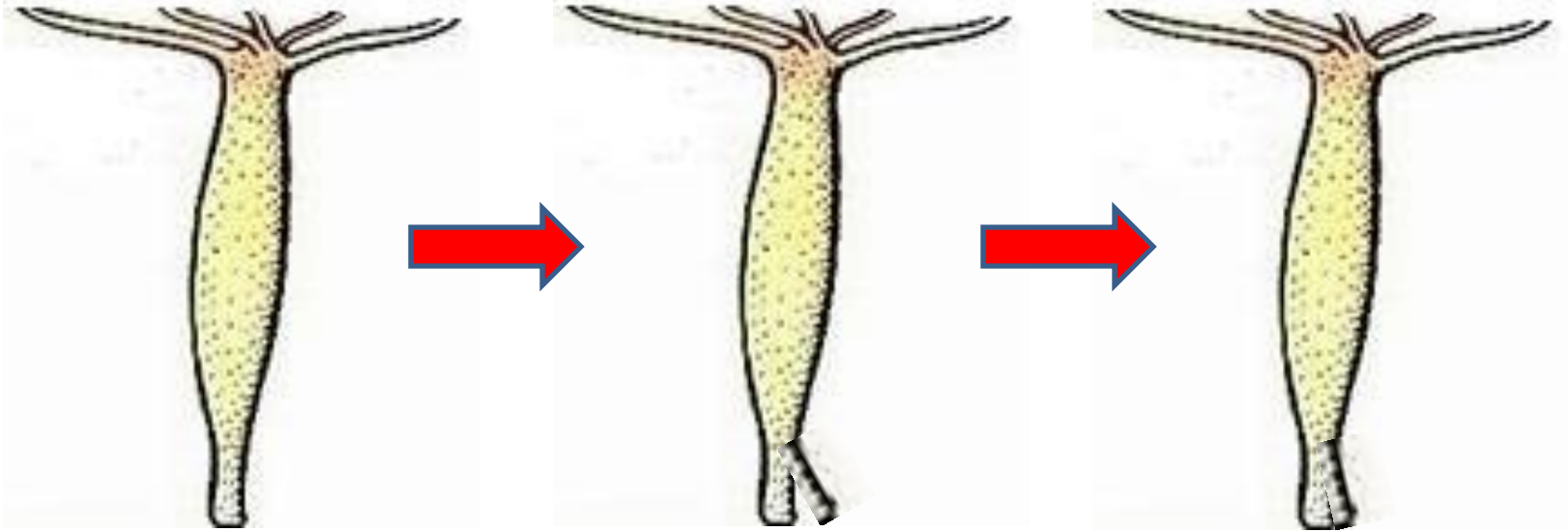

৪। ভাসা চলন (Floating)

হাইড্রা পদতলকে মুক্ত করে উল্টোভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ পদতল উপরের দিকে এবং মৌখিক তল নিচের দিকে অবস্থান করে। পদতলের গ্রন্থি থেকে গ্যাস ও মিউকাস নিঃসৃত হয়। নিঃসৃত গ্যাস ও মিউকাস মিলে বুদবুদ সৃষ্টি করে। বুদবুদের সাহায্যে হাইড্রা পানিতে ভেসে থাকে। এসময় স্রোতের টানে অথবা ঢেউয়ের আঘাতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভেসে চলে।

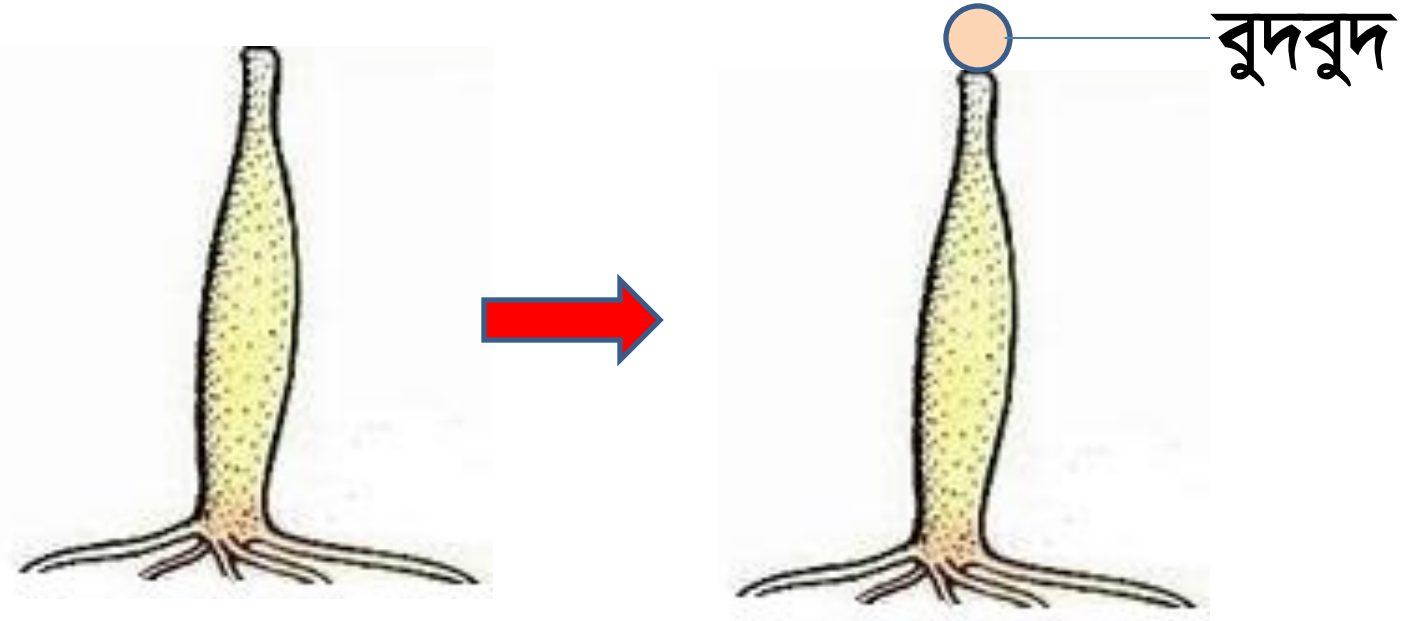

৫। সাঁতার চলন (Swimming)

হাইড্রা দেহকে মুক্ত করে আনুভূমিকভাবে অবস্থান করে। কর্ষিকাগুলোকে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করে। এসময় দেহকেও আন্দোলিত করে। এভাবে ঢেউ বা তরঙ্গের মতো আন্দোলন সৃষ্টি করে সাঁতার কাটতে থাকে।

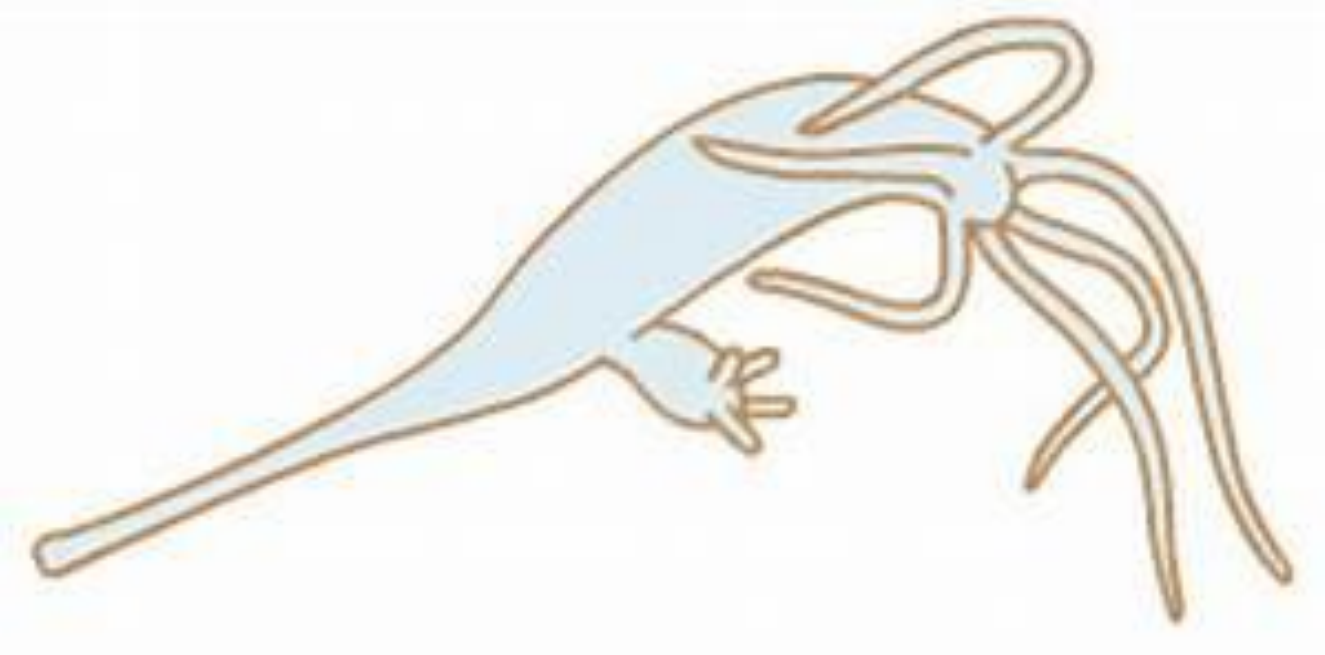

৬। হামাগুড়ি বা আরোহণ চলন (Climbing)

হাইড্রা কর্ষিকা দ্বারা নিমজ্জিত উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখাকে আঁকড়ে ধরে। পদতল মুক্ত করে সঙ্কুচিত করে। এরপর পদতলকে নতুন জায়গায় স্থাপন করে। এভাবে সঙ্কোচনের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করে।

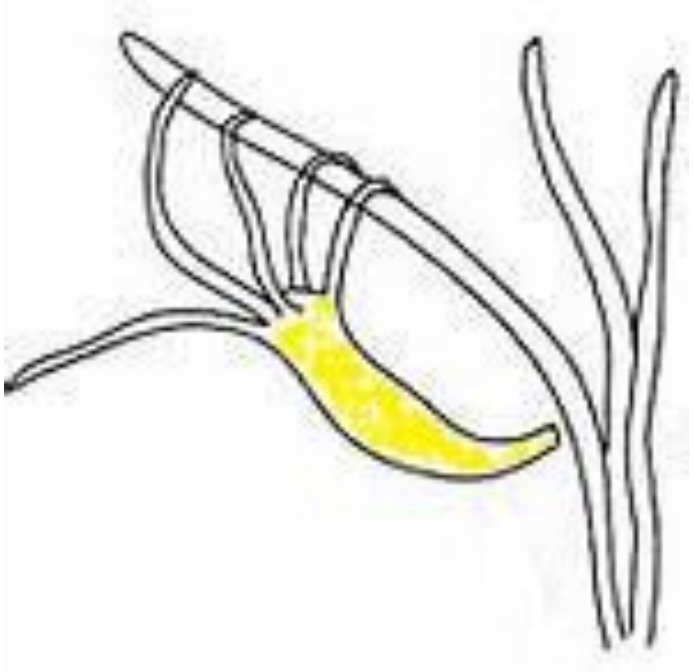

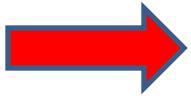

৭। হাঁটা চলন (Walking)

হাইড্রা পদতলকে মুক্ত করে উল্টোভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ পদতল উপরের দিকে এবং মৌখিক তল নিচের দিকে অবস্থান করে। দেহের সম্পূর্ণ ভার কর্ষিকার উপর স্থাপন করে। কর্ষিকাকে পায়ের মতো ব্যবহার করে ধীর গতিতে এগিয়ে চলে।

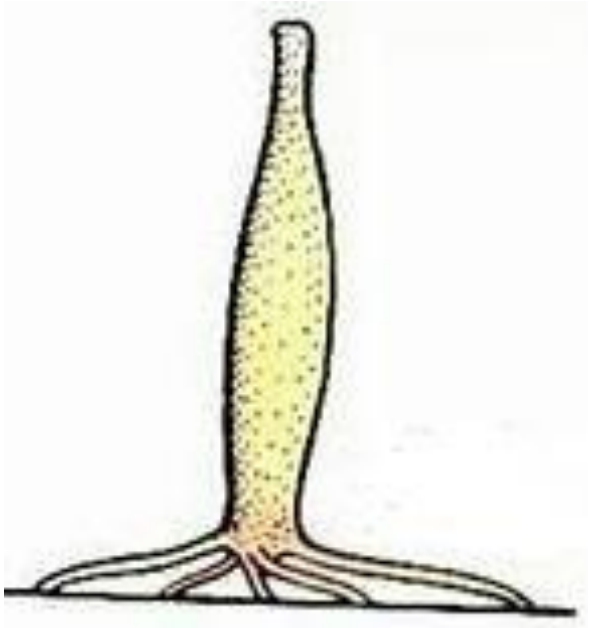

৮। দেহের সঙ্কোচন-প্রসারণ (Body contraction and expanion)

হাইড্রা দেহকে মুক্ত করে এবং পেশি আবরণী কোষের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটায়। এতে দেহের আকার দ্রুত খাটো ও লম্বা হয়। ফলে একধরণের চলন সৃষ্টি এবং স্থান পরিবর্তন করে।

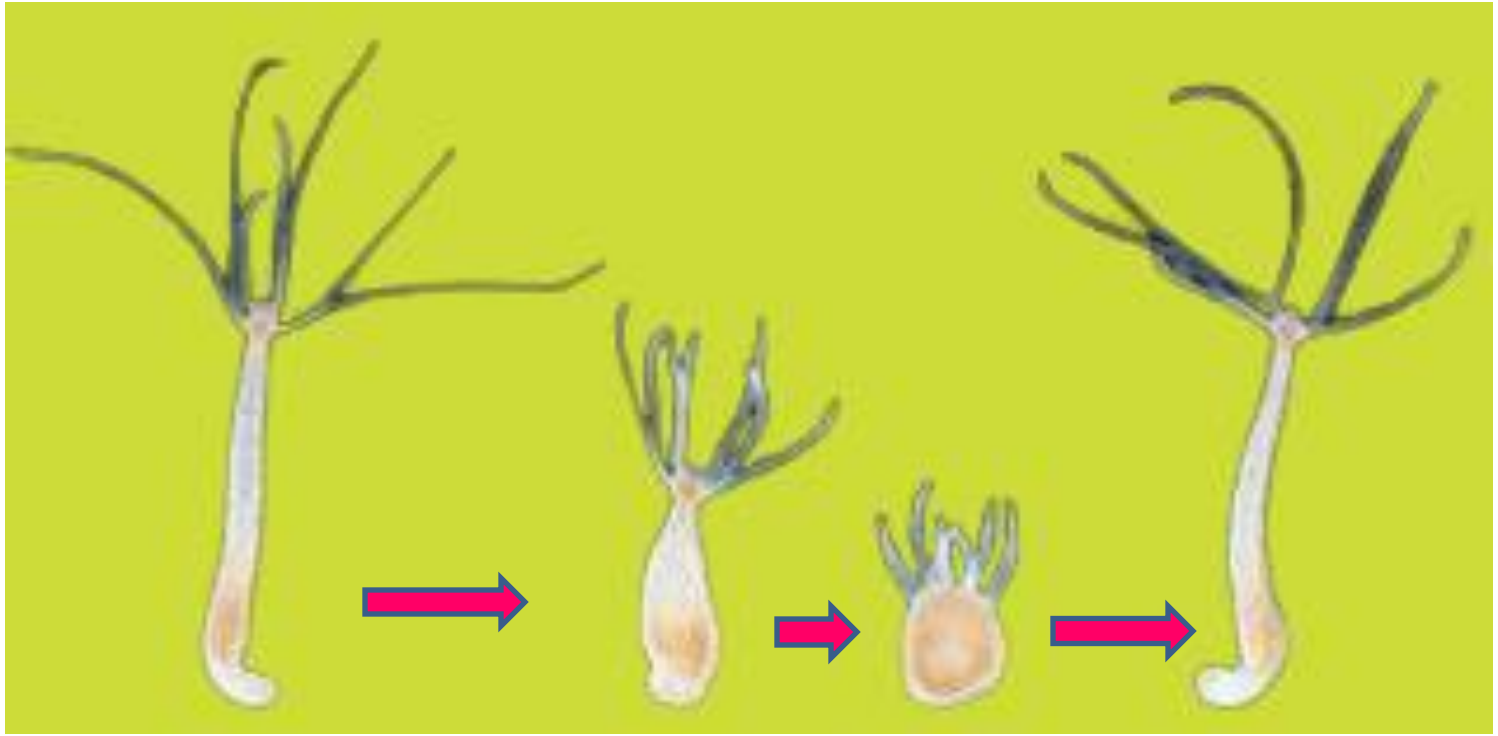

লুপিং ও সমারসল্টিং চলনের মধ্যে পার্থক্য

লুপিং চলন	সমারসল্টিং চলন
১। লুপিং হলো মন্থর গতির চলন	১। সমারসল্টিং হলো দ্রুত গতির চলন
২। দীর্ঘপথ অতিক্রমণের চলন	২। অল্পপথ অতিক্রমণের চলন
৩। একবার চলতে একটি লুপ তৈরী হয়	৩। একবার চলতে দুইটি লুপ তৈরী হয়
৪। পদতল কখনো উপরে উঠায় না	৪। পদতল উপরে উঠায়
৫। কখনো কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় না	৫। কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়
৬। কর্ষিকা সর্বদা গতি পথের দিকে থাকে	৬। পদতল এবং কর্ষিকা উভয় গতি পথের দিকে থাকে
৭। এটি বিশেষ চলন	৭। এটি সাধারণ চলন

লুপিং ও সমারসল্টিং চলনের তুলনামূলক আলোচনা

১। চলন প্রক্রিয়া ঃ লুপিং হলো মন্থর গতির চলন। সমারসল্টিং হলো দ্রুত গতির চলন

২। চলনের প্রকৃতি ঃ লুপিং হলো দীর্ঘপথ অতিক্রমণের চলন। সমারসল্টিং হলো অল্পপথ অতিক্রমণের চলন

৩। লুপের সংখ্যা ঃ লপিং এ একবার চলতে একটি লুপ তৈরী হয়। সমারসল্টিং এ একবার চলতে দুইটি লুপ তৈরী হয়

৪। অতিক্রান্ত দূরত্ব ঃ একটি লুপিং এ দেহের দৈঘ্যের চেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করে।

একবার ডিগবাজিতে দেহের দৈঘ্যের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করে।

৫। পদতলের অবস্থান ঃ লপিং চলনে পদতল সব সময় ভিত্তির সাথে থাকে।
সমারসল্টিং চলনে পদতল একবার উপরে এবং একবার নিচে থাকে।

৬। কর্ষিকার অবস্থান ঃ লপিং চলনে কর্ষিকা সর্বদা গতিপথের দিকে থাকে।
সমারসল্টিং চলনে কর্ষিকা একবার গতিপথের দিকে এবং একবার পিছনে থাকে।

১। চলন প্রক্রিয়া ঃ লুপিং হলো মন্থর গতির চলন। সমারসল্টিং হলো দ্রুত গতির চলন

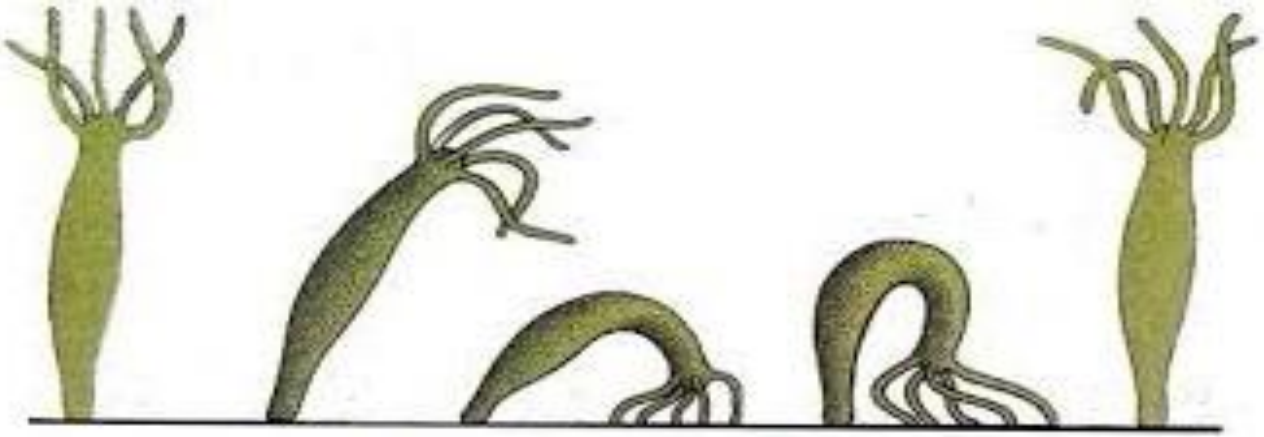

লুপিং

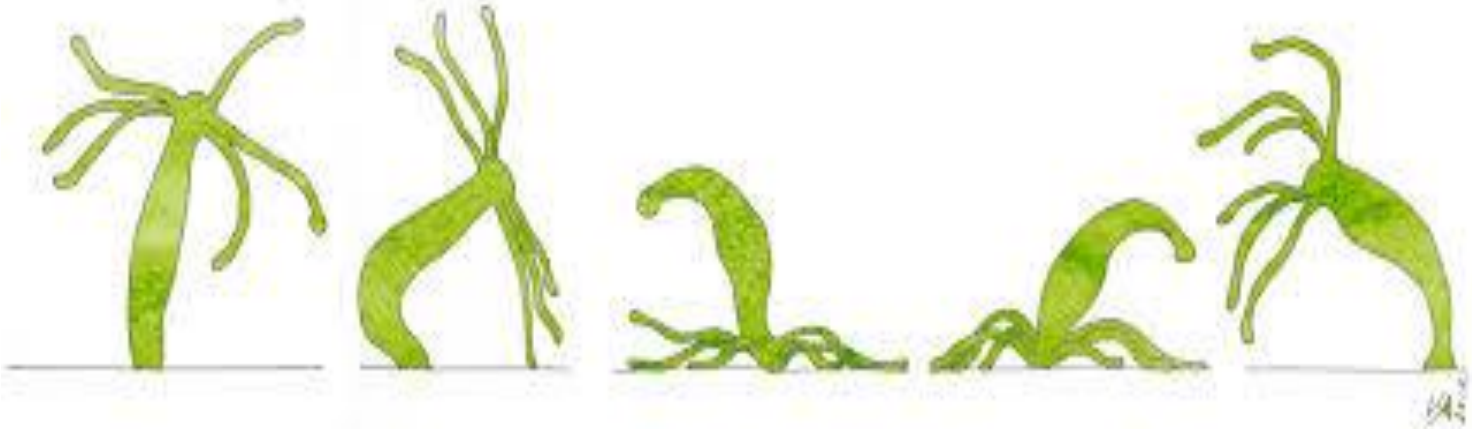

সমারসল্টিং

২। চলনের প্রকৃতি ঃ লুপিং হলো দীর্ঘপথ অতিক্রমণের চলন। সমারসল্টিং হলো অল্পপথ অতিক্রমণের চলন

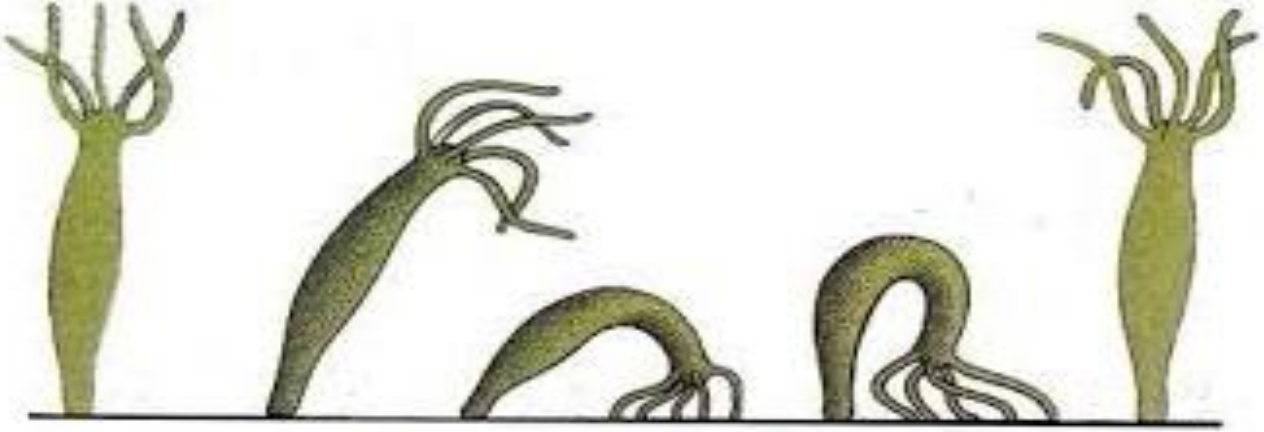

লুপিং

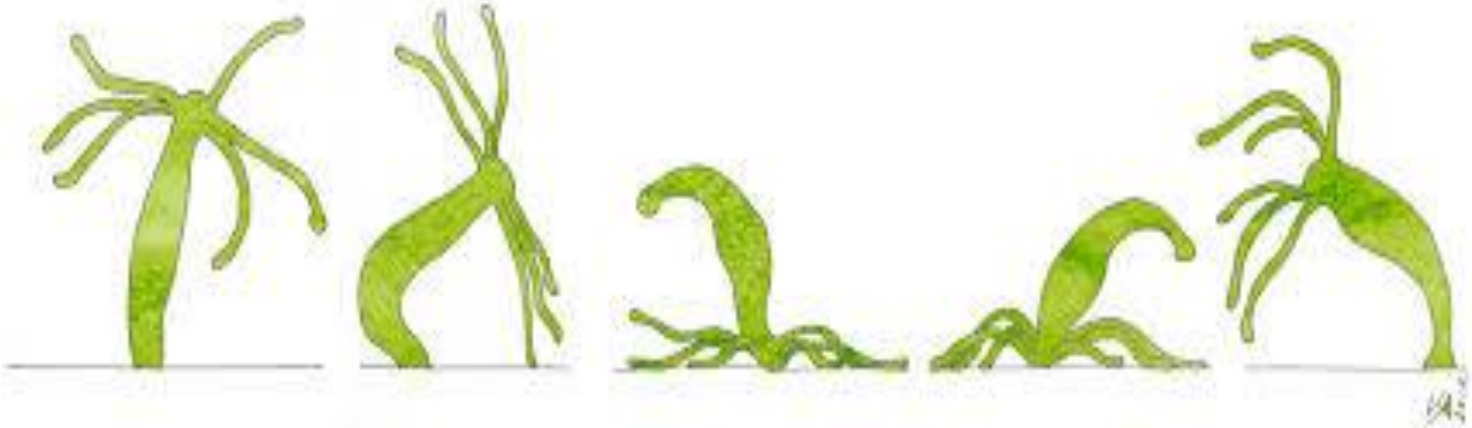

সমারসল্টিং

৩। লুপের সংখ্যা ঃ লপিং এ একবার চলতে একটি লুপ তৈরী হয়। সমারসল্টিং এ একবার চলতে দুইটি লুপ তৈরী হয়

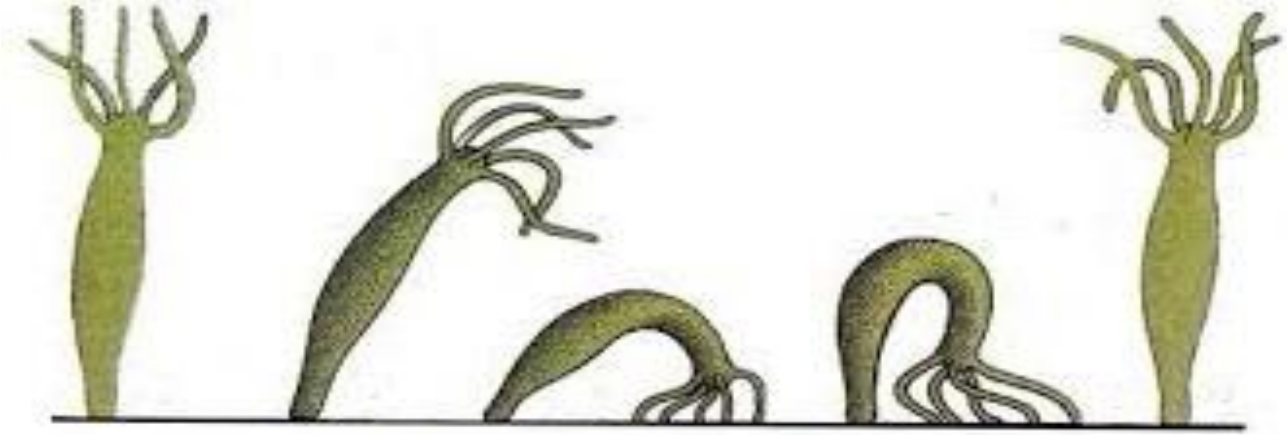

লুপিং

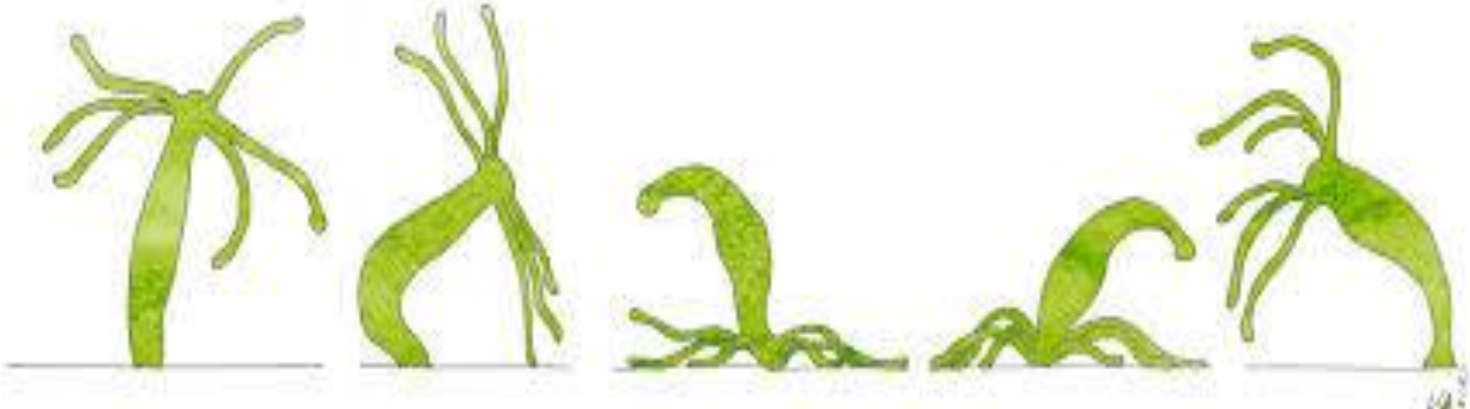

সমারসল্টিং

৪। অতিক্রান্ত দূরত্ব ঃ একটি লুপিং এ দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করে।

একবার ডিগবাজিতে দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করে।

লুপিং

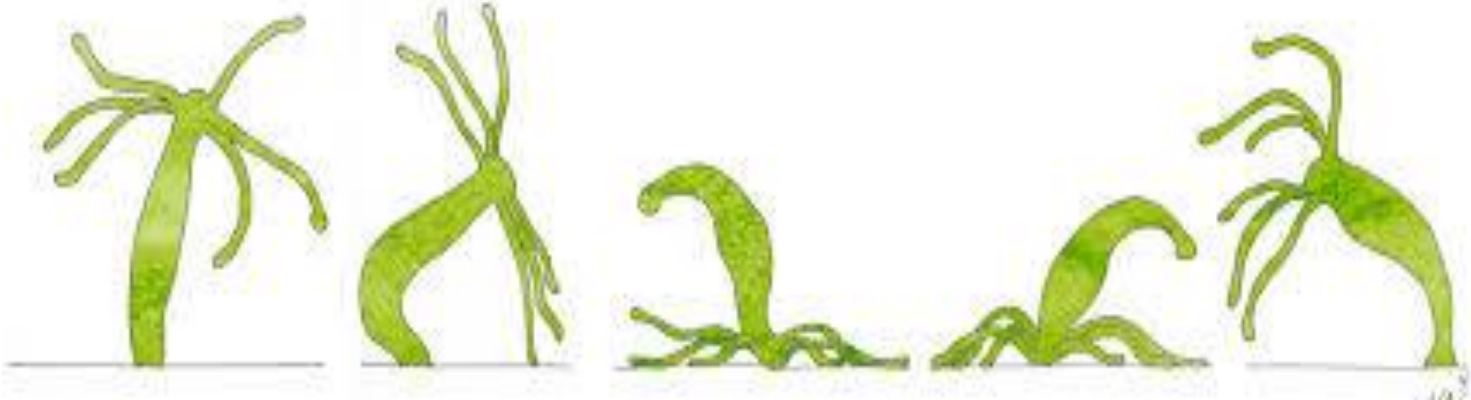

সমারসল্টিং

৫। পদতলের অবস্থান ঃ লপিং চলনে পদতল সব সময় ভিত্তির সাথে থাকে।
সমারসল্টিং চলনে পদতল একবার উপরে এবং একবার নিচে থাকে।

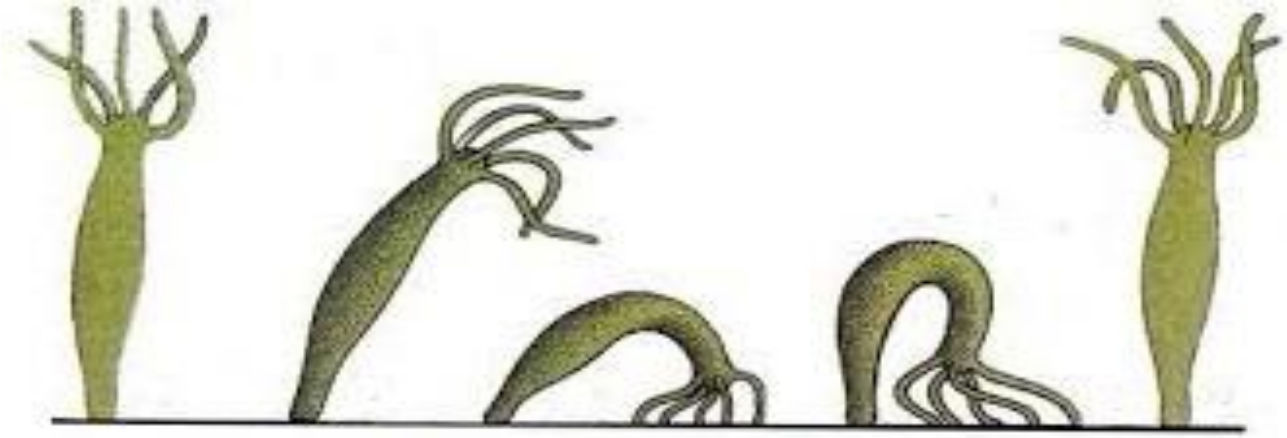

লুপিং

সমারসল্টিং

৬। কর্ষিকার অবস্থান ঃ লপিং চলনে কর্ষিকা সর্বদা গতিপথের দিকে থাকে।
সমারসল্টিং চলনে কর্ষিকা একবার গতিপথের দিকে এবং একবার পিছনে থাকে।

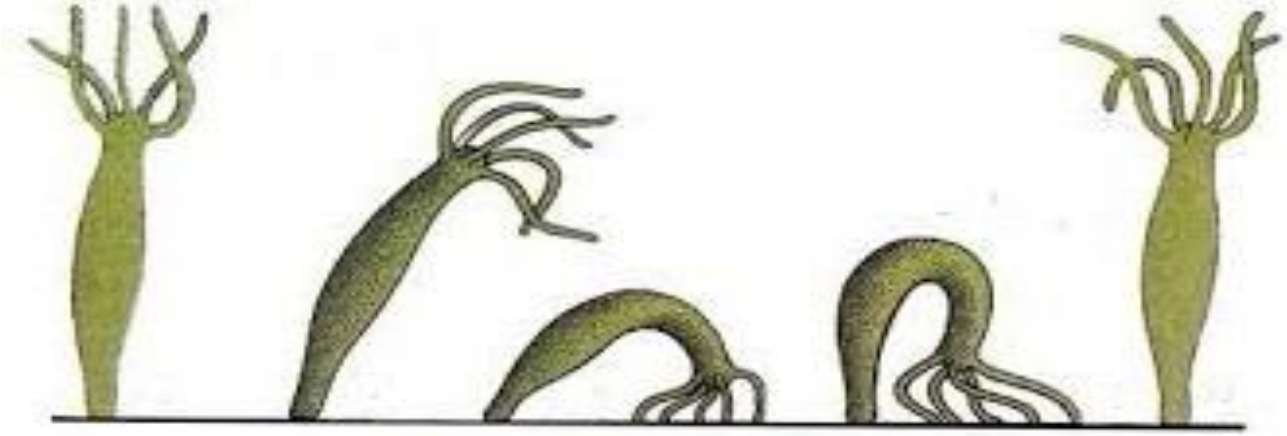

লুপিং

সমারসল্টিং

হাইড্রার মিথোজীবিতা

ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত দু'টি জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হওয়াকে মিথোজীবিতা বলে। ***Zoochlorella*** নামক শৈবাল এবং ***Chlorohydra viridissima*** নামক সবুজ হাইড্রা মিথোজীবিতা গঠন করে। হাইড্রার ডিম্বাণুর সাথে শৈবালের অংশ পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। তাই শৈবালকে **lifelong paying guest** বলে।

সাগর কুসুম ও ক্লাউন ফিস মিলে মিথোজীবিতা গঠন করে।

শৈবাল কিভাবে উপকৃত হয়

১। আশ্রয় লাভ ঃ শৈবাল হাইড্রার অন্তঃত্বকের পেশী আবরণী কোষে আশ্রয় গ্রহন করে।

২। CO_2 প্রাপ্তি ঃ হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2-কে শৈবাল সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহার করে।

৩। নাইট্রোজেনজাত পদার্থ প্রাপ্তি ঃ হাইড্রার বিপাকীয় নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থকে শৈবাল ব্যবহার করে আমিষ জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।

হাইড্রা কিভাবে উপকৃত হয়

১। খাদ্য ঃ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শৈবাল যে খাদ্য উৎপন্ন করে তার অতিরিক্ত অংশ হাইড্রা গ্রহন করে। শৈবাল মারা গেলে মৃতদেহকে হাইড্রা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

২। O_2 প্রাপ্তি ঃ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শৈবাল যে O_2 উৎপন্ন করে হাইড্রা তা শ্বসন কাজে ব্যয় করে।

৩। বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ঃ হাইড্রা শ্বসন প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন করে। শৈবাল এসব বর্জ্য পদার্থ গ্রহণ করে হাইড্রাকে বর্জ্য মুক্ত করে

পরজীবিতা ও মিথোজীবিতার মধ্যে পার্থক্য

পরজীবিতা	মিথোজীবিতা
১। পরজীবিতায় একটি পোষক, অন্যটি পরজীবী	১। মিথোজীবিতায় উভয়ে মিথোজীবী
২। পরজীবীটি পোষকের উপর নির্ভরশীল	২। মিথোজীবীরা পরস্পর নির্ভরশীল
৩। পোষক ক্ষতিগ্রস্থ এবং পরজীবী উপকৃত হয়	৩। উভয় সদস্য উপকৃত হয়
৪। পরজীবী ও পোষকের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে	৪। মিথোজীবীতায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে
৫। পরজীবীদের অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে	৫। মিথোজীবীদের অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে না
৬। পরজীবিতায় পোষকের মৃত্যু ঘটতে পারে	৬। মিথোজীবিতায় কারও মৃত্যু ঘটে না
৭। ইহা ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে	৭। ইহা দীর্ঘস্থায়ী
৮। মানুষ ও ম্যালেরিয়া জীবাণু	৮। হাইড্রা ও সবুজ শৈবাল

ডিপ্লোব্লাস্টিক (দ্বিস্তরী) ও ট্রিপ্লোব্লাস্টিক (ত্রিস্তরী) প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

ডিপ্লোব্লাস্টিক বা দ্বিস্তরী প্রাণী	ট্রিপ্লোব্লাস্টিক বা ত্রিস্তরী প্রাণী
১। এদের দেহ প্রাচীরে দুইটি স্তর থাকে	১। এদের দেহ প্রাচীরে তিনটি স্তর থাকে
২। এদের স্তর দু'টি হলে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম	২। স্তর তিনটি এক্টোডার্ম মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম
৩। এদের মেসোগ্লিয়া থাকে	৩। এদের মেসোগ্লিয়া থাকে না
৪। ভ্রুণস্তর দু'টি অপরিবর্তিত থাকে	৪। ভ্রুণস্তর তিনটি পরিবর্তিত হয়
৫। কোষগুলো কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র গঠন করে না	৫। কোষগুলো কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র গঠন করে
৬। সিলেন্টেরন নামক দেহগহ্বর থাকে	৬। সিলোম নামক দেহগহ্বর থাকে
৭। পৌষ্টিক নালী থাকে না	৭। পৌষ্টিক নালী থাকে

হাইড্রার শ্রমবন্টন

বহুকোষী প্রাণীদেহে নির্দিষ্ট কোষ, কলা বা অঙ্গ নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করলে তাকে শ্রমবন্টন বলে। প্রাণীজগতে নিডারিয়ান তথা *Hydra*-তে সর্বপ্রথম শ্রমবন্টন দেখা যায়।

Hydra-তে আঙ্গিক এবং কোষীয় উভয় শ্রমবন্টন দেখা যায়।

আঙ্গিক শ্রমবন্টন

কোষীয় শ্রমবন্টন

আঙ্গিক শ্রমবন্টন

১। মুখছিদ্র ঃ খাদ্য গ্রহণ, বর্জ্য নিষ্কাশন ও পানি
প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

২। কর্ষিকা ঃ চলন, শিকার ধরা, আরোহন ও আত্মরক্ষায় ব্যবহার করে।

৩। দেহকান্ড ঃ চলনে সহায়তা এবং মুকুল ও জননাঙ্গ ধারণ করে।

৪। এপিডার্মিস ঃ দেহ গঠন ও প্রতিরক্ষার কাজ করে।

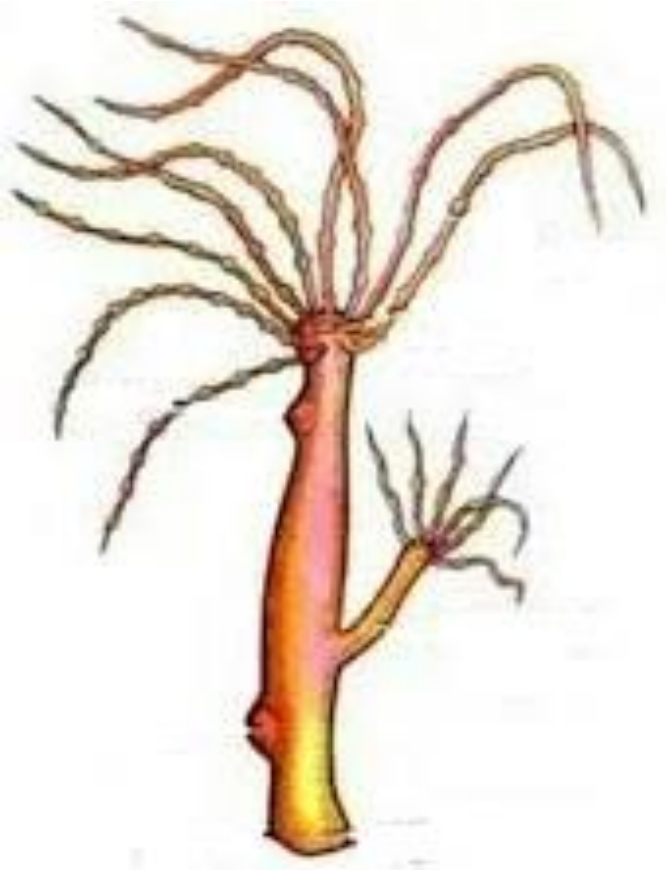

৫। মেসোগ্লিয়া ঃ ভিত্তিতল ও কাঠামো গঠন করে এবং দেহের সংকোচন-প্রসারণে সহায়তা করে।

৬। সিলেনটেরন ঃ খাদ্য পরিপাক ও সংবহনের কাজ করে।

৭। পাদচাকতি ঃ চলন এবং দেহকে আবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে।

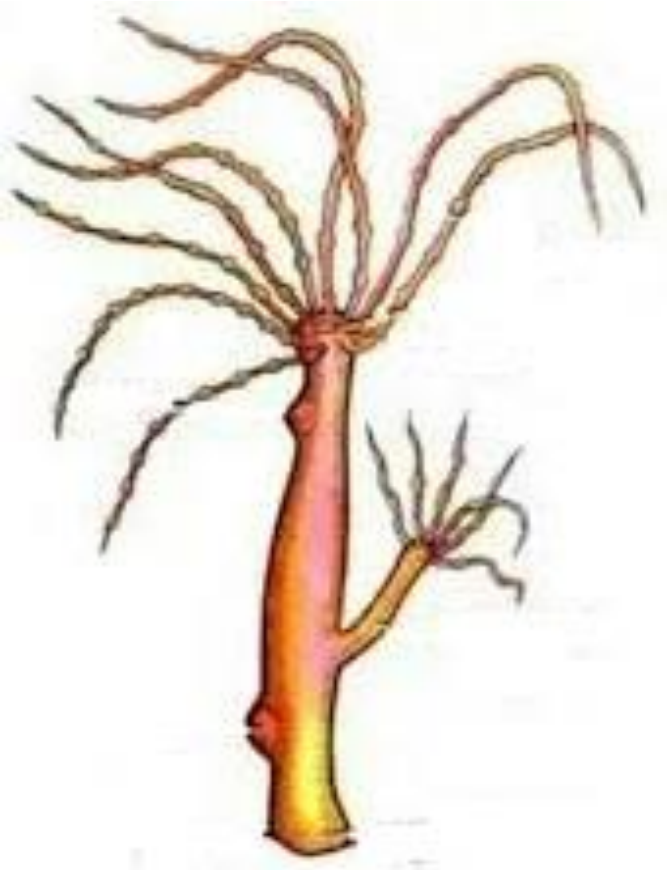

কোষীয় শ্রমবন্টন

১। পেশি আবরণী কোষ ঃ দেহ আবরণী তৈরী, চলন এবং শিকার ধরায় সাহায্য করে।

২। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ ঃ দেহের যে কোন কোষ বা অঙ্গ সৃষ্টি করে।

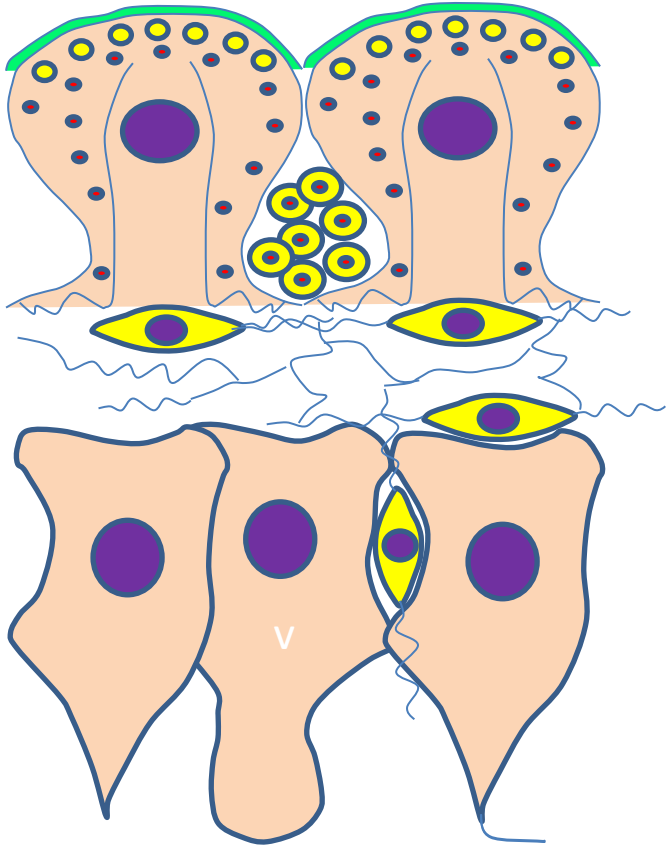

৩। সংবেদী ও স্নায়ু কোষ ঃ উদ্দীপনা গ্রহণ ও প্রতিবেদন তৈরী করে।

৪। পুষ্টি কোষ ঃ বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষী পরিপাক সম্পন্ন করে।

৫। গ্রন্থি কোষ ঃ এনজাইম ও আঠালো পদার্থ ক্ষরণ করে।

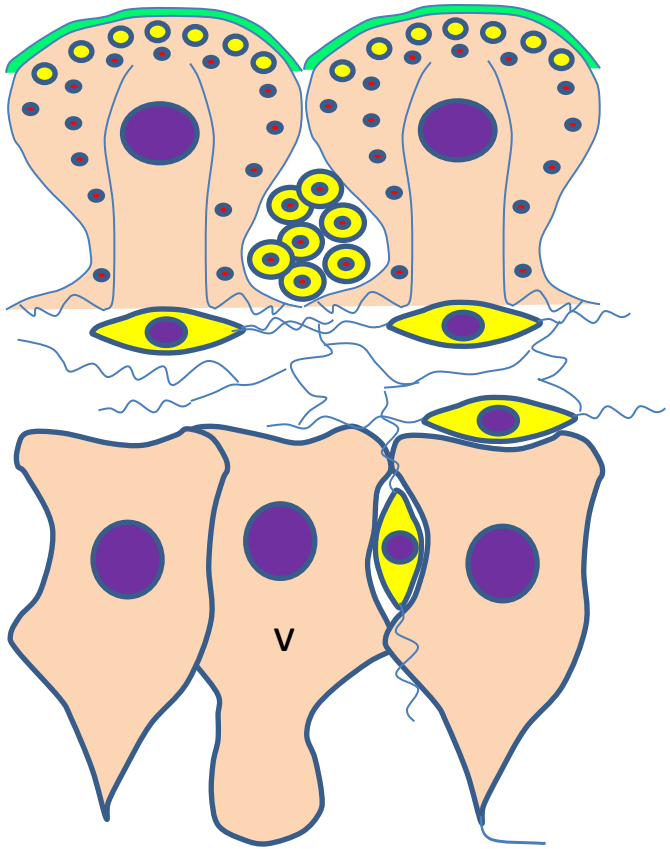

ধন্যবাদ